পঞ্চপল্লব।

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

মূল্য দশ আনা।

কলিকাতা,

বহুবাজার, ১৪ নং মদন বড়াল লেন হইতে "লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস" যন্ত্রে

শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

ও

হুসেনগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রদ্ধাভাজন, সাহিত্যানুরাগী সুলেখক

শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন

বার-এ্যাট্‌-ল

মহোদয় কর কমলেষু—

ভূমিকা।

ভূমিকা লেখানো আজকাল একটী মস্ত বেয়ারাম হইয়া উঠিয়াছে ; গ্রন্থ যেমনই হ'ক, গ্রন্থের ভিতর যতই রাবিশ লেখাই থাকুক, গ্রন্থকারগণ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত কোন ব্যক্তির দ্বারা একটা ভূমিকা লেখাইয়া লইতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন !—কিন্তু কেন ?

জাতীয় ভাষা একজনের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে না, প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর হৃদয়রক্তে উহা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। দেবী শ্বেতাঙ্গিনীর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দানের অধিকার সকলেরই আছে ; ভাষা-লক্ষ্মী ভক্তের পূত অর্ঘ যে স্বর্ণপাত্রে ভিন্ন গ্রহণ করেন না—এমন ত নহে !

পঞ্চপল্লবের লেখক শ্রীমান পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, সুকবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার, অথচ তিনি ভূমিকা লিখিবার ভার আমার ন্যায় অযোগ্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন ; কিন্তু ভূমিকায় লিখিবার আছে কি ? বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে — সুদূর লক্ষ্ণৌ নগরীর নিভৃত কক্ষে বসিয়া যিনি বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া থাকেন, মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে গমন করিয়াও যিনি সাহিত্য সাধনায় বিরত হয়েন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি। তারপর

তাঁহার যোগ্যতা ?—সে সম্বন্ধেও আমরা কিছুই বলিব না; সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ পঞ্চপল্লবের রসাস্বাদন করিয়া তাহার বিচার করুন। আমি শ্রীমানের গুণমুগ্ধ। আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহার সাহিত্য সাধনা সফল হউক।

কলিকাতা ;
কোজাগর পূর্ণিমা,
সন ১৩২৩ সাল।

(সদ্ধর্ম্মব্রত) শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ক[illegible]কণ্ঠ,
(দেবীপুর—বর্দ্ধমান)
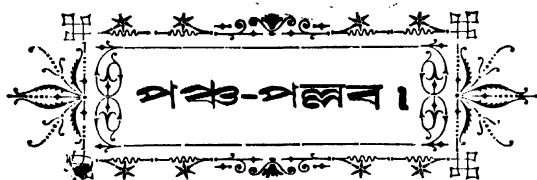
কালচক্রে।

[১]

রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্র আজ মৃত্যুশয্যায়। রবীন্দ্রনাথ বাস্পাকুল নেত্রে শিয়রে বসিয়া অনিমিষনেত্রে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে বৃক্ষ-কোটরস্থ পেচকের তীব্র আর্ত্তনাদ যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীর্ণ কুটিরের এক দিকে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। অপর দিকে শয্যায় শায়িত অমরেন্দ্রনাথ। কুটীরটীও নিস্তব্ধ; মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘনিশ্বাস কুটীরটীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এরূপভাবে আরও একঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। এতক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ পিতার দিকে চাহিল এবং ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা আপনি এখনও ব'সে রয়েছেন?" পুত্রের কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের চক্ষু দিয়া দর-দর-ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; —ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "আমি না থাকিলে তোমার কাছে আর কে

বসে থাক্‌বে বাবা? আমরা দীনহীন—আমাদের অর্থবল নেই, লোকবলও নেই;—অর্থ থাকিলে কি আজ তোমায় বিনা চিকিৎসায় হারাতুম?" রবীন্দ্রনাথ আর বলিতে পারিলেন না; যেন কি এক অসহনীয় দুঃখে তাঁর কণ্ঠরোধ হইল। ক্ষীণকণ্ঠে অমরেন্দ্রনাথ বলিল,—"বাবা, সংসারে সকলেই কি ধনবান? সংসারে আমাদের মত দুঃখীই অনেক। যদি আমার মৃত্যুই ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে চিকিৎসায় কি ফল হবে? বাবা, যতই চেষ্টা করুন, কিছুতেই রাখতে পার্ব্বেন না। আর যদি তা না হয়, এযাত্রা যদি আমার অদৃষ্টে মৃত্যু না থাকে, বিনা-চিকিৎসাতেই আমি আরোগ্য লাভ কর্ব্বো। আপনি উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?" "কেন উৎকণ্ঠিত হচ্ছি?—যে পুত্রের পিতা সেই জানে; তুমি কি ক'রে জান্‌বে বাবা? আজ তিন মাস কাল তুমি শয্যাগত আছ; লোকাভাবে শুধু তোমার সেবার জন্য আমি চাকরীটুকু ছেড়ে বসে আছি; পক্ষাধিককাল আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রেছি। এত করেও যদি তোমায় বাচাতে না পারি, তাহ'লে বুঝবো—সংসারে দরিদ্রের উপর ভগবানেরও করুণা নেই।" রবীন্দ্রনাথ অতিকষ্টে উত্তেজনা দমন করিয়া আবার বলিলেন, "বাবা, তুমি যখন নিতান্ত শিশু, তখন তোমার সতীসাধ্বী জননী বিসূচিকারোগে ইহলোক ত্যাগ করেন; সেই অবধি তোমাকে নিয়ে, সব কষ্ট ভুলে আছি। আমার অবস্থা এতদূর হীন ছিল না। আমার আত্মীয়েরা আমার মাতাকে ভুলিয়ে ষড়যন্ত্র ক'রে একটা সই ক'রে নিয়ে আমার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। মাতার স্বর্গারোহণের পর আমি আমার প্রকৃত অবস্থা বেশ বুঝতে পারলুম। আত্মীয়েরা সকলেই তখন একে একে স'রে দাঁড়ালো। তুমি তখন

নিতান্ত শিশু। তোমার মাতাকে, তোমাকে, আর আমার বাস্তুদেবতা গোপালজীকে নিয়ে ভদ্রাসন ত্যাগ ক'রে এই কুটীরে এলাম। দুর্ভাগ্য একলা আসে না। দুই মাস অতীত হইতে না হইতে তোমার মাতাও ইহসংসার ত্যাগ করিলেন। মনে বড় বিশ্বাস ছিল, আমি গোপালজীকে ধ'রে আছি—কখনো দুঃখ পেতে হবে না। বোধ হয় এতদিনে আমার সে বিশ্বাস টুটে গেল"। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ দমনে অসমর্থ হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্র পিতার হাতখানি নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বাবা, অমন কথা বল্‌বেন না; দুঃখে দেবতার উপর বিশ্বাস হারাবেন না। আমরা আমাদের কর্ম্মফল ভোগ কর্চ্ছি; তাতে দেবতার দোষ কি?" রবীন্দ্রনাথ পুত্রের কথায় কোন উত্তর না দিয়া অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইলেন. দেখিলেন—তাঁহার একমাত্র শেষের সম্বল পুত্ররত্নের জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ! অমরেন্দ্রনাথের আকর্ণবিশ্রান্ত-লোচনযুগল ধীর—স্থির—পলকহীন; অধরোষ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইতেছে। সেই রোগক্লিষ্ট মলিন মুখে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! রবীন্দ্রনাথ আত্মহারা হইলেন। আবেগপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন, "বাবা অমর"!—কে উত্তর দিবে? অমরের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া কোন্ অজানিত দেশে উড়িয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পরে কাশী যাত্রা করিলেন। সংসার তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার কুটীরে যাহা কিছু ছিল, তাহার কিছুই সঙ্গে লইলেন না; এক

বস্ত্র পরিধানে তাঁহার বাস্তুদেবতা গোপালজীকে লইয়া চলিলেন। পুত্রের শোকে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার হ্রাস হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে উন্মাদের অনেক লক্ষণ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ—পশ্চিমাঞ্চলে বেশ শীত পড়িয়াছে। রবীন্দ্রের গাত্রে শীতবস্ত্র নাই, অত্যন্ত শীতেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই—ক্রমাগত চলিয়াছেন। তখন এদেশে রেলপথ ছিল না। রবীন্দ্র পদব্রজে চলিয়াছেন। দিনের পর দিন যাইতেছে, রবীন্দ্রের গতি অপ্রতিহত; সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে কখনও বৃক্ষতলে, কখনও গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রিযাপন করিতেছেন। আহারের কোনও নিয়ম নাই,—যেখানে আহারপ্রাপ্তির উপায় সহজসাধ্য, সেখানে আহার করিতেছেন, নচেৎ অনাহারেই দিন কাটিয়া যায়। এখন তাঁহাকে দেখিলে সহজে চিনিতে পারা যায় না। তেমন সুন্দর কান্তি আর নাই; গৌরবর্ণ মসাবর্ণে পরিণত, কেশ রুক্ষ, দেহ শীর্ণ, পরিধানে মলিন শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রখণ্ড। কখনও প্রশস্ত, কখনও সংকীর্ণ পথ, কখনও জলপথ, কখনও বা বনপথ অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ চলিয়াছেন।

পুণ্যভূমি ৺কাশীধামে পৌছিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই সংকল্প করিলেন যে, তাঁহার বাস্তুদেবতা গোপালজীকে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-বক্ষে বিসর্জ্জন দিবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মণি-কর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনে নানারূপ চিন্তা—সে চিন্তার শেষ নাই! পথশ্রমে ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ গঙ্গার ঘাটে উপবেশন করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ও অন্যান্য দেব-মন্দিরের আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতেছে। কুত্রাপি সন্ন্যাসিগণের

"বোম্ বোম্ হর হর" শব্দ দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গাবক্ষে ঊর্ম্মিমালা শশধরের প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া আনন্দে নাচিতেছে,—সুনীল অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকারাজি হাসিতেছে। শ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ অচিরাৎ নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাযোগে রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন ;—যেন তিনি এক অজানা স্থানে আসিয়াছেন,—সম্মুখে বিস্তীর্ণ স্রোতস্বতী প্রবাহিতা—পশ্চাতে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা—নদীতটে বিস্তৃত-শাখ ফল-ভারাবনত পাদপশ্রেণী ; স্রোতস্বতীর কুলুকুলুধ্বনি, বসন্তপবন-বাহিত অস্ফুট কোকিল-কাকলী, নববিকশিত কুসুম-সৌরভে রবীন্দ্রের প্রাণ ভরিয়া উঠিল, রবীন্দ্র সব ভুলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন নদীবক্ষে এক ক্ষুদ্র তরণী ক্ষেপণী সাহায্যে বাহিত হইয়া তাঁহারাই দিকে অগ্রসর হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ তরণীর আরোহীদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ক্রমেই তরণী নিকটস্থ হইল ; সোৎসুকে রবীন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখেন, সেই তরণীমধ্যে তাঁহার সেই হারানিধি পুত্র অমরেন্দ্রনাথ এবং অমরেন্দ্রের পার্শ্বে তাহারই সমবয়স্ক একটী বালক! রবীন্দ্র ব্যগ্রভাবে তাঁহার পুত্রকে কোলে লইবার জন্য নদীগর্ভে ছুটিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হন, স্রোতস্বতীর সলিলরাশি যেন ততই সরিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমাগত ছুটিয়া রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। নদী যেন অধিকতর বিস্তৃত হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—তরণী আরও নিকটে আসিল। যেন অমরেন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন—"বাবা!" রবীন্দ্রনাথ হর্ষে বিষাদে আত্মহারা হইলেন। আবেগপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন—"বাবা অমর! এতদিন পরে বুড়ো বাপকে মনে পড়েছে? বাবা, যখন এসেছিস্

তখন আর দূরে রয়েছিস্ কেন? আয় আমার কোলে আয়।" নৌকা হইতে অমরেন্দ্র বলিল—"তা তো পার্ব্বোনা বাবা! আমি এখন আপনার কাছ থেকে বহুদূরে আছি; কেমন করে আপনার কোলে যাব? শুধু আজ আপনাকে দেখ্তে এসেছি,—সংসারের সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই।"

"যদি কোলে আস্বিনে তবে দেখা দিয়ে কষ্ট দেওয়া কেন"? রবীন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতিকষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, সত্যই কি আস্বিনে?" অমরেন্দ্রনাথ বলিল—"না বাবা, সাধ্য নেই।" রবীন্দ্রনাথ তখন অমরেন্দ্রর সঙ্গী বালকটির দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"বাবা, তোর সঙ্গে ঐ বালকটি কে?" অমর বলিল,—"বাবা, ইনি আমাদের বাস্তুদেবতা গোপালজী—আমার সখা।" রবীন্দ্র বলিলেন,—"সে কি, অমর! গোপালজী যে আমার কোলে?" অমর বলিল—"বাবা, আপনি যে তাঁকে বিসর্জ্জন দেবেন মনে করেছিলেন, তাই তিনি আপনার কাছ থেকে চলে এসেছেন।" রবীন্দ্র বলিলেন, "সে কি? শেষে গোপালজীও আমাকে ত্যাগ করলেন!" অমরেন্দ্র বলিল,—"উনি ত আপনাকে ত্যাগ করেননি বাবা; আপনি দেবতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে তাঁকে ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছিলেন।" রবীন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, পিতার অনুরোধ রাখ্—গোপালজীকে ফিরিয়ে দে!" গোপালজী তখন বলিলেন—"হাতে পেয়েও বিশ্বাস হারিয়ে ত্যাগ করেছ; এখন আবার নূতন করে সাধনা কর, তবে আবার আমায় পাবে, অমরকেও পাবে।" রবীন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল,—উঠিয়া দেখেন, তাঁহার বাস্তুদেবতা গোপালজী তাঁহার কোলে নাই।

[২]

দিন যায়—কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না; সুখেই হোক, দুঃখেই হোক, দিন যায়। বাস্তুদেবতা গোপালজীকে হারাইয়া অবধি—রবীন্দ্রনাথ পুত্রশোক ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁর ভাবশূন্য পলকহীন দৃষ্টি দেখিলে মনে হয়, তিনি এখন প্রকৃতই উন্মাদ। এই অবস্থায় তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া এখন হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠমাস—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—অবিরত "লূ" চলিতেছে,—ঘরের বাহির হয় কার সাধ্য। দূরে ক্বচিৎ দুই একটী পাখীর ডাক শোনা যাইতেছে। কোন স্থানে বৃক্ষতলে একটী সারমেয় দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে। কখনও কখনও এক একটী "চোখ গেল পাখী" উচ্চবৃক্ষশাখায় বসিয়া ডাকিতেছে। অদূরস্থ পর্ব্বতমালার উপরিস্থিত উন্নতশীর্ষ তরুরাজির মধ্য দিয়া প্রবাহিত সমীরণের সন্ সন্ শব্দ, পাদদেশেপ্রবাহিতা ত্রিতাপহারিণী সুরধুনীর অব্যক্তমধুর কুলুধ্বনি স্থানটীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। পূর্ব্ববিবৃত ঘটনার পর প্রায় ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে। ছয়বৎসর পূর্ব্বে যিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছেন, এখন দেখিলে তিনি চিনিতে পারিবেন না। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই সমভাবে থাকে না; বিশেষতঃ মানুষের পরিবর্ত্তন অতি অল্পেই সাধিত হয়। রবীন্দ্রের শুভ্র-কেশরাশি জটা বাঁধিয়া গিয়াছে। শ্বেতশ্মশ্রুরাশি বক্ষঃদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াছে, দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। পরিধানে জীর্ণ আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড। রবীন্দ্রনাথ চলিয়াছেন,—একটী সংকীর্ণ বনপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন - ক্রমে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে একটী শাল্মলী-বৃক্ষতলে কতকগুলি বনজ লতাপত্রদ্বারা রচিত একটী শয্যা।

রবীন্দ্রনাথ সেই শয্যায় উপবেশন করিলেন; কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া কি ভাবিলেন। তারপর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, —"গোপালজি! এখনও দীনের প্রতি প্রসন্ন হলেন না প্রভু! বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এজীবনে আর তোমার করুণালাভে সক্ষম হব না। তবে আর বৃথা এ দেহভার বহনে লাভ কি? আজ তিনদিন অনাহারে আছি, তবুও তোমার দয়া হ'লনা! জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট দেহে প্রাণ আর কতক্ষণ থাকবে? যাক্‌—এইভাবে যতক্ষণ যায় যাক্‌! এখন মৃত্যুই আমার প্রকৃত শান্তি। মৃত্যু! তুমিও সময় বুঝে নিষ্ঠুর হলে? সুকুমার শিশুকে গ্রাস কর্ত্তে ত তোমার খুব ঔৎসুক্য দেখ্‌তে পাই; সংসার-তাপে তাপিত জরাজীর্ণ বৃদ্ধের প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? রবীন্দ্রের দুই চক্ষু দিয়া প্রাবৃটের বারিধারার ন্যায় অবিরত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল, রবীন্দ্রনাথ আবার উঠিলেন। যে পথে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কাহার হস্ত স্পর্শিত হওয়ায় তাঁহার গমনে বাধা পড়িল;—তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন,—যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার শিরায় শিরায় এক অপূর্ব্ব তাড়িতস্রোত ছুটিল। দেখিলেন, এক পূর্ণযৌবনা, আলুলায়িতকেশা, গৈরিকবসনা, অনিন্দ্যসুন্দরী ভৈরবী-মূর্ত্তি! তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন মা ভবানী অসুরধ্বংসকারী মহাশূলহস্তে ভৈরবীমূর্ত্তিতে সম্মুখে দণ্ডায়মানা! রবীন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে ভৈরবীর চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "মা ভবানি! এসেছিস্‌—এতদিন

পরে কি দীন সন্তানকে মনে পড়েছে—?" রবীন্দ্র বালকের ন্যায় ভৈরবীর পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভৈরবী কোমল স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"সন্ন্যাসি! আমার সঙ্গে এস, অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দিলে প্রকৃত সাধনা হয় না; তাতে অভীষ্ট পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক বরং পাপস্পর্শ করে। সন্ন্যাসি! সাধন-পথের পথিক হয়েছ; জাননা কি—জীবমাত্রের দেহে সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের সত্তা বিদ্যমান? আত্মা কি? আত্মার তৃপ্তি-সাধন না কল্লে কি তুমি প্রত্যবায়ভাগী হবে না?"

"মা, আমি অজ্ঞান, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি অন্ধ, আমায় প্রকৃত পথ দেখিয়ে দিন।"

"সন্ন্যাসী অগ্রে ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রে একাগ্রতা অভ্যাস কর্ত্তে শিক্ষা কর, পরে ক্রমে আপনার কর্ত্তব্য-পথ চিনে নিতে পার্ব্বে। শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্য প্রকৃত শিক্ষার স্থান নয়। তোমার শিক্ষার এখনও অনেক বাকী; তুমি আবার সংসারে ফিরে যাও, সাংসারিক লোকের চরিত্র অধ্যয়ন কর। তার মধ্যে আদর্শ ক'রে সেই আদর্শ অনুযায়ী আপনার চরিত্র গঠিত কর। মনে স্থির জেনো, শিক্ষা অরণ্যে হয় না,—শিক্ষাস্থল সংসার; তোমাকে নূতন সংসারে জড়িত হ'তে বল্‌ছি না,—শুধু শিক্ষার জন্য সংসার পরিদর্শন কর্ত্তে বল্‌ছি। তাতেই তোমার ধৈর্য্য—তাতেই তোমার একাগ্রতা অভ্যাস হবে। সর্ব্ববিষয়ে আড়ম্বরশূন্য হতে চেষ্টা কর্‌বে।"

"মা! আমি সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু কোনও স্থান শিক্ষা-লাভের প্রকৃত উপযোগী ব'লে মনে হয় না। তীর্থক্ষেত্রে যে এতদূর পাপকর্ম্ম সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হয়, তা আমার ধারণা ছিল না। এত প্রতারক, এত

শঠ, এত কদাচারী লোক যে তীর্থে বাস করে, এরূপ কল্পনা আমার মনে কখনও স্থান পেত'না। এতদিনে আমার সে ভ্রম ভেঙ্গে গেছে। মা, তীর্থ-ভ্রমণে আমার আর স্পৃহা নেই,—ব'লে দিন, তীর্থস্থান ভিন্ন অন্যস্থানে কি প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না ?"

"সন্ন্যাসি ! তীর্থক্ষেত্র যদি পুণ্যক্ষেত্র না হবে, তবে সকলে তীর্থ-দর্শনের জন্য ব্যগ্র হয় কেন ?"

"আমার বোধ হয় সেটা লোকের ভুল।"

"সন্ন্যাসি ! ভুল তোমারই। যেমন অন্ধকার না হলে আলোকের সত্তা অনুভূত হয় না, যেমন দুঃখ না হলে সুখের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, যেমন যন্ত্রণা না হলে শান্তির অভাব অনুমিত হয় না, যেমন কুরূপ না হলে সুরূপের মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি পাপ না হ'লে পুণ্যের অস্তিত্ব কেমন করে বুঝ্‌তে পার্ব্বে, সন্ন্যাসি ? বিপরীত-সম্বন্ধবিশিষ্ট দুইটী বস্তু সংসারের সর্ব্বত্রই পাশাপাশি রক্ষিত। কক্ষমধ্যস্থ দীপাধারে প্রজ্বলিত দীপের দিকে দৃষ্টিপাত কর,—দেখিতে পাইবে, দীপালোকে সমুদয় কক্ষটী আলোকিত, কিন্তু দীপাধারের নিম্নভাগে অন্ধকার ;—ইহাতেই বিষয়টী আরও স্পষ্ট বুঝতে পার্ব্বে ! মনে ক'রোনা তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যাত্মা লোকের অভাব। অনুসন্ধান কর—সাক্ষাৎ পাবে। নিবিড় অরণ্যে পলাশকুসুম প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া মনে করিও না—সেখানে মধুরসৌরভপূর্ণ প্রসূন প্রস্ফুটিত হয় না। ধৈর্য্য-সহকারে অনুসন্ধান কর—আশা পূর্ণ হবে। আর একটি কথা, জীবনে কখনও নিজের লক্ষ্য হারিও না—একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে কর্ত্তব্য-পথ হতে অনেক দূর পেছিয়ে পড়্‌বে। সাবধান !"

মুহূর্ত্তমধ্যে ভৈরবী কোথায় অদৃশ্য হইলেন;—রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল-ভাবে মা'—মা' বলিয়া কতক্ষণ চীৎকার করিলেন—কোন উত্তর পাইলেন না।

[৩]

নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অবশেষে জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তৎপূর্ব্বে একবার জন্মভূমি দর্শন করিবারও ইচ্ছা হইল। সেই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ত্রিবেণী যাত্রা করিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীনামক স্থান হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। কথিত আছে, ঐ স্থানীয় জঙ্গলে পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদিগের আড্ডা ছিল। পথিকেরা সন্ধ্যার পর ঐ সকল স্থান দিয়া প্রায়ই গমনাগমন করিত না। রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান ত্রিবেণী হইতে ৩ মাইল দূরে। আজকাল সেখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর মগরা নামক ষ্টেসন হইয়াছে; আগে সেখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল।

দিবা অবসানপ্রায়। তপনদেব স্বনামখ্যাত কেরাণীর ন্যায় যেন সমস্তদিন পরিশ্রমের পর ক্রোধে লোহিতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় আবাসে গমনোদ্দেশ্যে অস্তাচলের পথে আরোহণ করিয়াছেন। বিহগকুলের স্ব স্ব কুলায়গমনকালীন অব্যক্ত মধুরশব্দে দিগন্ত মুখরিত হইতেছে। দূরে রাখালগণের প্রকৃতিগত চীৎকার শুনা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিন চলিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হওয়ায় একটী অশ্বত্থবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতে অদূরবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অনুমানে বুঝিলেন যে, কোন অসহায়া রমণী দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এরূপ যন্ত্রণা-

সূচক আর্ত্তনাদ করিতেছে। রবীন্দ্র ত্বরিতপদে সেইদিকে চলিলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন—একটী বৃক্ষতলে ভীষণ-আকৃতি ৮ জন দস্যু, সেই বৃক্ষমূলে হস্তপদবদ্ধ একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, ধূল্যবলুণ্ঠিতা রোরুদ্যমানা একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা এবং বালিকার পার্শ্বে কিছুদূরে হস্তপদবদ্ধ একটী যুবতী এবং সেই যুবতীর পার্শ্বে একটী রোরুদ্যমান ... বৎসরের শিশু। চারিজন দস্যু বস্ত্রদ্বারা যুবতীর হাত পা মুখ বাঁধিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। বালিকার সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। তাহার সুন্দর কর্ণযুগল হইতে কর্ণাভরণ বলপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া লওয়ায় দরদরধারে শোণিত নিঃসৃত হইতেছে, ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, পরিধেয়বস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন। বালিকা নিরাভরণা,—দেখিলে বোধ হয় তাহার অঙ্গে যথেষ্ট অলঙ্কার ছিল, দুর্ব্বৃত্তেরা সমুদয় অপহরণ করিয়াছে। বালিকা অনিন্দ্যসুন্দরী। যুবতীরও গাত্রের অলঙ্কারাদি দস্যুগণ বলপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়াছে; তাহার অবস্থাও বালিকার অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক উপস্থিতি দুর্ব্বৃত্তগণের কার্য্যে একটু বাধাপ্রদান করিল। কিন্তু তাহাতে দুষ্টগণের প্রাণে শঙ্কা কোথায়? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,— "এ বেটা ভণ্ডসাধু কোত্থেকে এ'ল? দে বেটাকে নিকেশ ক'রে দে"। অপর একজন কহিল, "ও বেটা ত আমাদের কাজে বাধা দেয়নি, ওকে মেরে কি হবে? বরং ওকে এই বুড়োর কাছে বেঁধে রাখ্।" দস্যুগণ কি ভাবিয়া তাহার মতেই মত দিল। দুইজন দস্যু আসিয়া রবীন্দ্রনাথের হাত পা বাঁধিয়া সেই বৃদ্ধের পার্শ্বে রাখিল। পরে দুর্ব্বৃত্তগণ যুবতীকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া অরণ্যমধ্য হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে দুইজন দস্যু সেইস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং বালিকাকে লইয়া পূর্ব্ববৎ গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রায় নয়টা। হায়! এই জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে হতভাগ্য-দিগকে সাহায্য করিবার কেহই নাই! রবীন্দ্রনাথের মনে বারম্বার এই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার নিজেরও কোন সামর্থ্য নাই। চীৎকার করিলে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে যে কোন ব্যক্তি সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, সে আশাও খুব কম। রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিকে বন্ধনযন্ত্রণা ও দুরাচারগণের নিদারুণ প্রহারে বৃদ্ধ মৃতপ্রায়, সংজ্ঞাশূন্য; অন্যদিকে ক্ষুৎপিপাসাকাতর শিশু কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া মৃতবৎ নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া আছে। মানুষের পক্ষে এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা একেবারে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ নিজের বন্ধন মোচন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা রবীন্দ্রকে লতাপাশে বন্ধন করিয়াছিল; তিনি অতিকষ্টে পদদ্বয়ের বন্ধন বৃক্ষমূলে ঘর্ষণ করিয়া ছিন্ন করিলেন এবং এই প্রকারে হস্তের বন্ধনও মোচন করিলেন। সত্বর উঠিয়া বৃদ্ধকেও বন্ধনমুক্ত করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ তখনও সংজ্ঞাহীন। অনন্যোপায় হইয়া রবীন্দ্র জল আনিবার জন্য জলাশয়ের অন্বেষণে ছুটিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না; কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সেই অরণ্যমধ্যে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিতে পাইলেন। কিন্তু জল আনয়নের উপযোগী কোন পাত্র তাঁহার সঙ্গে ছিল না। সম্বলের মধ্যে তাঁহার পরিধেয় সেই জীর্ণবস্ত্রখণ্ড। রবীন্দ্র সেই বস্ত্রখণ্ডের কিয়দংশ ভিজাইলেন এবং বটপত্রের একটী ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাও সলিলপূর্ণ করিলেন। উক্ত প্রক্রিয়ায় সলিল আনয়ন

করিয়া রবীন্দ্র বৃদ্ধের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু হায়! চেতনা পাইয়া বৃদ্ধ 'হা সরমা!'—'হা সরমা!' বলিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রবীন্দ্র অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধের সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না। একে অসহনীয় মর্ম্মযাতনা, তার উপর বৃক্ষমূলে পতিত হওয়ায় বৃদ্ধের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। সেই আঘাতেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্র বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ ইহ-জীবনের মত সংজ্ঞা হারাইয়াছে। রবীন্দ্র বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনটী গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহার সম্মুখে। প্রথম—বৃদ্ধের সৎকার; দ্বিতীয়—শিশুর জীবন-রক্ষা; তৃতীয়—ঐ বৃদ্ধের সঙ্গিনীদ্বয়ের উদ্ধার। রবীন্দ্র চিন্তামগ্ন হইলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে রবীন্দ্র উঠিলেন, শিশুকে বক্ষে লইয়া অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নৈশ প্রকৃতির গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অরণ্যসীমান্তে রবীন্দ্রনাথ ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে একবার ডাকিলেন—'মা!' দূর হইতে প্রতিধ্বনি বহিয়া আনিল—"মা"!

ত্রিবেণী পৌঁছিতে রাত্রি বারটা বাজিল। এই নীরব নিশীথে শিশুকে কাহার আশ্রয়ে রাখিবেন, এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে আকুল করিয়া তুলিল। হঠাৎ একজনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। ত্রিবেণীতে রবীন্দ্রের এক বাল্যবন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে শিশুটীকে রাখিবেন এইরূপ কল্পনা করিয়া রবীন্দ্র তাঁহার বাল্যবন্ধুর গৃহাভিমুখে চলিলেন। আজ কাল ত্রিবেণীতে যেখানে "গাজীর কুঠার" আছে, তারই অনতিদূরে রবীন্দ্রের বন্ধুর বাড়ী ছিল। তাঁর বন্ধু বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ধনীর সন্তান—পৈত্রিক জমিদারির বার্ষিক আয় প্রায় লক্ষাধিক টাকা। রবীন্দ্র দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে

বন্ধুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; তদবধি অদ্যাপি রবীন্দ্রের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় তাঁর বন্ধু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ আর ইহধামে নাই। সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ পরে আজ নীরব নিশাথ রাত্রে সন্ন্যাসিবেশে রবীন্দ্র আপনার বাল্যবন্ধুর বাড়াতে পদার্পণ করিলেন। সদর দেউড়াতে পৌঁছিয়া রবীন্দ্র দেখিলেন—দ্বার রুদ্ধ ; দ্বারে করাঘাত করিয়া বারম্বার চীৎকার করায় ভিতর হইতে "বাজখাই" আওয়াজে উত্তর আসিল—"কোন হ্যায় ?"

রবীন্দ্র বলিলেন—"আমি।"

"হামি কোন হ্যায়, বেকুব্ ?"

"আমি রবীন্দ্র—দরজা খোল।"

"কেয়া ?"

"আমি রবীন্দ্র—দরজা খোল।"

"তুমারা ঘর কাঁহা।"

"আমায় জাননা বাবা, আমি হেমেন্দ্রের বন্ধু।"

দরজা উন্মুক্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পাগড়া মাথায়—মোটা বাঁশের লাঠি হস্তে এক ভোজপুরী পালোয়ানের আবির্ভাব হইল। পালোয়ান সম্মুখে সন্নাসিমূর্ত্তি দেখিয়া একবার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা ;—বাজখাই আওয়াজ আরও চড়াইয়া বলিল,—"কেয়া শালা চোট্টা, এহাঁ দাগবাজী করনে আয়া ?"

ভোজপুরার বাক্য শেষ হইতে না হইতে রবীন্দ্রনাথের মস্তকে সজোরে এক লাঠির আঘাত পড়িল। রবীন্দ্র "মা" বলিয়া ভূতলে পতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইলেন।

যখন রবীন্দ্র চেতনা লাভ করিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে অনেক লোক জমিয়াছে। গৃহস্বামী হেমেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন,—রবীন্দ্রের বক্ষঃস্থিত সেই অনাথ শিশু আহত অবস্থায় হেমেন্দ্র বাবুর জনৈক ভৃত্যের কোলে,—শিশুর ললাট কাটিয়া গিয়াছে—তথা হইতে শোণিতধারা ঝরিতেছে। রবীন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না; লাঠির আঘাতে তাঁহারও মাথা কাটিয়া গিয়াছে—দরদর-ধারে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতেছে। রবীন্দ্র কাতরদৃষ্টিতে হেমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া অতিকষ্টে বলিলেন—"হেম—।" রবীন্দ্রের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার স্বর হেমেন্দ্রের কর্ণে যেন কতদিনের পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। হেমেন্দ্র সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—সন্ন্যাসীর চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত। সহসা তাঁহার যেন কত কালের একটী পুরাতন পরিচিত মুখ মনে পড়িল। তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল; তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—সন্ন্যাসীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। রবীন্দ্র অতিকষ্টে আবার বলিলেন "হেম—!" হেমেন্দ্রের বুক কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। তিনি রবীন্দ্রকে চিনিতে পারিলেন। যুগপৎ হর্ষে, বিষাদে, অনুতাপে তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি রবীন্দ্রের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

অবিরত শোণিতস্রাবে রবীন্দ্রের জীর্ণদেহের শক্তিটুকুও ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল। রবীন্দ্র সত্বরই সংজ্ঞা হারাইলেন। হেমেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সযত্নে ধরিয়া সাবধানে আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করাইলেন। শিশুটীকে তাঁহার ভগ্নী অনুপমার হস্তে দিয়া

স্বয়ং রবীন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বেই চিকিৎসককে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। অবিলম্বে চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুচিকিৎসায় এবং হেমেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম যত্নে রবীন্দ্রনাথের দেহ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। শয্যাগত হইয়া অবধি রবীন্দ্র পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত প্রায় একরূপ ভুলিয়াছিলেন; কারণ অনেক সময় সংজ্ঞাশূন্য থাকিতেন।

আট দশ দিন হইতে রবীন্দ্রনাথ ন্যূনাধিক একঘণ্টাকাল তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া শয্যার উপর বসিয়া থাকেন। অদ্য প্রাতে চিকিৎসক আসিয়া তাঁহাকে একটু একটু পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথ উপরের বারান্দায় যষ্টিতে ভর দিয়া বেড়াইতেছেন; পার্শ্বে হেমেন্দ্র-নাথ। হেমেন্দ্র আজ বড় প্রফুল্ল; রবীন্দ্রের আরোগ্যলাভই হেমেন্দ্রের প্রফুল্লতার কারণ। উভয়ে বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে নানা-বিষয়ক গল্প করিতেছেন—কত নূতন—কত পুরাতন,—সে গল্পের শেষ নাই। হেমেন্দ্রনাথ যাহা কখনও কল্পনায় মনোমধ্যে আনয়ন করিতে পারেন নাই, তাঁহার যে বাল্যবন্ধু একদিন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যে অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে পাইয়া পুনরায় হারাইতে বসিয়াছিলেন, আজ সেই বন্ধুকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া পাইয়া হেমেন্দ্রের হৃদয় পুলকপূর্ণ; তাই আজ তাঁহাদের অর্থশূন্য অথচ আবেগ-পরিপূর্ণ মনের কথার বিনিময় চলিতেছে। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—রবীন্দ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রবীন্দ্র বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহারা উভয়ে একটী

কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, পূর্ব্বে তিনি যে কক্ষে ছিলেন, এটী তাহা নহে। কক্ষটী বেশ সুসজ্জিত; ছোট বড় মাঝারী অনেকগুলি ছবি এবং বিবিধবর্ণের কয়েকটী দেওয়ালগিরীদ্বারা ঘরটী বেশ সাজান। ঘরের একপার্শ্বে একখানি পালঙ্ক; অপরপার্শ্বে মেজের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ কার্পেটমোড়া এবং দুই দিকের দুই কোণে দুটী সুন্দর আলমারী। এতদ্ভিন্ন রবীন্দ্র আর একটী দৃশ্য দেখিলেন,—একটী সুন্দরী যুবতী একটী দুই বৎসরবয়স্ক শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছেন;—শিশুটী বালসুলভ চাপল্য বশতঃ কখনও যুবতীর সুন্দর নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিতেছে; কখনও বক্ষের বস্ত্র টানিতেছে, কখনও বা মুখের দুগ্ধ "ফু" "ফু" করিয়া ফেলিয়া দিতেছে। রবীন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যুবতী সাগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে বলিল, "রবীনদাদা! আজ আপনাকে বেশ ভাল দেখ্‌ছি—এতক্ষণ ধরে বেড়াতে পার্লেন!" "হাঁ দিদি, আজ আমি অনেকটা ভাল আছি। আর দুই একদিন গেলে বাঁচি—তাইতো—কি হতে কি হলো!" রবীন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনুপমা বলিল, "রবীনদাদা কি ভাব্‌ছেন? এখনও আপনি অসুস্থ; অত ভাব্‌বেন না, অত ভাব্‌লে শীঘ্র সেরে উঠ্‌তে পারবেন না।" "দিদি! তুমি জান না, আমি কি বিপদে পড়েছি। শুধু তোমাদের যত্নে এই শিশুটীর জীবন আজ নিরাপদ হয়েছে; কিন্তু দু'টা হতভাগিনী অবলা রমণী দস্যুহস্তে! তাদের কে উদ্ধার কর্ব্বে? বোধ হয় তারা আর বেঁচে নাই।"

"হাঁ দাদা মনে পড়েছে, আপনি বিকারের ঘোরে "সরমা—সরমা" ব'লে উঠতেন, আমি কিছুই বুঝতে পার্ত্তুম না। এখন বুঝচি, আপনি

যে দুটী রমণীর কথা বলচেন, তাদেরই একটীর নাম সরমা। আচ্ছা, রবীনদাদা, তারা এখন কোথায় ?"

"এই মাত্র জানি যে, দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ তাদের আড্ডায় নিয়ে গেছে ; কিন্তু দিদি, তাদের আড্ডা যে কোথায় তা জানিনে।"

"ত্রিবেণীর জঙ্গলের নিকটেই কোথাও তাদের আড্ডা আছে। আচ্ছা দাদা, আপনি সেরে উঠুন, তার পর তাদের সন্ধান কর্ব্বেন। উপস্থিত আমি চেষ্টা করি, যদি কোন সন্ধান পাই।"

"তুমি ছেলে মানুষ, তায় স্ত্রীলোক ; তুমি কেমন ক'রে সন্ধান কর্ব্বে দিদি ? সত্য দিদি, আজ দুঃখের উপরেও তোমার কথা শুনে না হেসে থাকতে পারলুম্ না। হেম, শুন্‌চো, দিদির কথা শুন্‌চো ?" হেমেন্দ্র এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলেন। রবীন্দ্রের কথা তিনি শুনিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। রবীন্দ্র পুনরপি বলিলেন, "হেম, শুনচো ?"

"কি—"

"অনুপমার কথা।"

"অনুপমা কি বল্‌ছে ?"

"অনুপমা বল্‌ছে, ডাকাতদের আড্ডার সন্ধান ক'রে সেই মেয়ে দু'টীকে উদ্ধার ক'র্ব্বে।"

হেমেন্দ্র ও রবীন্দ্র অনুপমার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন— সেই শরদিন্দুনিভাননে কি এক অপূর্ব্ব ভাব ! সেই অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী বালবিধবার দেহ হইতে কি এক অপূর্ব্ব অনৈসর্গিক জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে ! সুন্দরীর দৃষ্টি ধীর, স্থির ও ভূমিসংলগ্ন। বক্ষে সেই সুকুমার

শিশু! যুবতীকে দেখিলে মন যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। হেমেন্দ্র বলিলেন, "অনুপমা—পারবে?"

"পারি না পারি—চেষ্টা কর্ত্তে দোষ কি দাদা? নারী হয়ে জন্মেছি ব'লে কি জগতের কোন কাজ কর্‌বার অধিকার নেই? দাদা, গুরুদেব বলেছেন, রমণীমাত্রেই সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ এবং জননী-স্বরূপা। মানুষমাত্রেই নারীর সন্তান। মা হ'য়ে কি কখনও সন্তানের দুঃখে স্থির থাকতে পারে? দাদা, আপনি জ্ঞানী; আপনিই বলুন দেখি এ অবস্থায় আপনার কর্ত্তব্য কি?"

"তাইতো অনুপমা, বলচো বটে, কিন্তু—"

"কিন্তু নারী—এই না? তাতে ভাবনার বিষয় কি আছে দাদা? গুরুদেবের কৃপায় আমি আমার কর্ত্তব্য পথ চিনে নিতে পেরেছি। যখন তাঁর কৃপায় পথ চিনতে পেরেছি, তখন তাঁরই কৃপায় সেই পথে অগ্রসর হব, কেউ বাধা দিতে পার্ব্বে না। দাদা, আমার জন্য কোন চিন্তা কর্ব্বেন না!"

"অনুপমা, তোমায় আমি এতদিন চিন্তে পারিনি। আর আমি তোমার কার্য্যে বাধা দেব না। তুমি যা' ভাল বোঝ, কর"।

রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণ অনুপমার মুখের দিকে অনিমিষনেত্রে চাহিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"মা ভৈরবী, সত্যই বলেছ, আমার শিক্ষার এখনও অনেক বাকী। আর এ কথাও সত্য,—শিক্ষা অরণ্যে হয় না, শিক্ষাস্থল সংসার। দিদি, ধন্য তোমার একাগ্রতা, ধন্য তোমার গুরুভক্তি। তুমি চেষ্টা কল্লে যে এই দুটী অবলাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই!"

[৪]

অনুপমা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন; হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন—"অনুপমা, দাঁড়াও; আর একটা কথা তোমায় বলবার আছে।"—

"কি বল দাদা?"

"দেখ অনুপমা, তুমি দিনকতক অপেক্ষা কর, রবীন যে ক'দিন না বেশ সুস্থ হয়, সে ক'দিন ডাকাতের সন্ধান আমি নিজেই করি; যদি আবশ্যক হয়, তুমি সাহায্য করিও। তার পর রবীন সুস্থ হ'লে আমরা দুজনেই কার্য্য উদ্ধার কর্ব্বো তখন আর তোমার সাহায্যের বোধ হয় প্রয়োজন হবে না। দেখ, সংসারে তোমার কর্ব্বার কাজ অনেক! এই বিশাল সংসার পরিচালনের ভার তোমার উপর, অনাথ শিশুর লালন-পালনের ভার তোমার উপর। আগে হাতের কাজ কর, তার পর অবসর পাও, ইচ্ছামত কার্য্য করিও।"

"দাদা, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা মনে করলেই আপনার অবসর এবং সেই সঙ্গে তাদের কর্ত্তব্যও খুঁজে নিতে পারে। কাজ যতই হোক, মন দিয়ে করলে কতক্ষণ? বেশ আপনি যা বলছেন তাই কর্ব্বো।"

এই সময় বাহির হইতে পরিচারিকা বলিল, "মা, অনেক কাঙ্গালী এসে দরজায় চীৎকার ক'চ্ছে, কিছুতেই থামছে না; আপনি একবার আসুন।"

অনুপমা বলিলেন—"তাদের একটু চুপ কর্ত্তে বল, আমি যাচ্ছি।"

"তারা কিছুতেই মানছে না"—

"তবে যাচ্ছি" বলিয়া অনুপমা শিশুকে কোলে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অনুপমা প্রস্থান করিলে পর হেমেন্দ্রনাথ সেই কক্ষমধ্যস্থ একটী আলমারি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী 'রিভলভার' বাহির করিলেন এবং তাহা নিজের পকেটে লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গমনকালে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বলিয়া গেলেন—"রবীন, বিশেষ কার্য্য-বশতঃ আমি স্থানান্তরে যাচ্ছি, আজ বোধ হয় ফিরতে পার্ব্ব না।" চিন্তানিবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ এ কথার উত্তরে কেবল মাত্র বলিলেন—"বেশ।" হেমেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ বাহিরের কোলাহল শুনিয়া সেই কক্ষস্থ একটী জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন—খিড়কীর বাগানে বহুসংখ্যক কাঙ্গালী কোলাহল করিতেছে। এই সময়ে আলু-লায়িতকুন্তলা শুভ্রবসনা অনুপমা সেই শিশুকে বক্ষে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাঙ্গালীদের কোলাহল আরও বর্দ্ধিত হইল। অনুপমার সঙ্গে একটি পরিচারিকা। পরিচারিকা একটি বৃহৎ ডালায় চিড়া-মুড়কী লইয়া আসিয়াছে। অনুপমার আদেশমত পরিচারিকা তাহা কাঙ্গালীদিগকে বিতরণ করিতে লাগিল।

কাঙ্গালীরা উচ্চনাদে "মা তোমার জয় হোক, মা তোমার জয় হোক" বলিয়া দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। চিড়া-মুড়কী বিতরণ শেষ হইলে জনৈক ভৃত্য একটী সুবৃহৎ কাপড়ের "গাঁটরী', লইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইল। তখনই "গাঁটরী" খোলা হইল এবং অনুপমা স্বয়ং সেই গাঁটরী হইতে বস্ত্র লইয়া প্রত্যেক কাঙ্গালীকে এক একখানি করিয়া বিতরণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনিমেষলোচনে তাহাই দেখিতে লাগি-লেন। রবীন্দ্রনাথের নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাঁহার মনে

হইল, যেন মা ঈশানী জগজ্জননী মূর্ত্তিতে আজ তাঁর সম্মুখে ! অনুপমার চারুইন্দীবরতুল্য বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত ! বস্ত্রবিতরণ শেষ হইলে অনুপমা পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন "রবীনদাদা, দাদা কোথায় ?"

"বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছেন।"

"এত বেলায় ? কখন্ ফিরবেন ?

"ব'লে গেছেন,—বোধ হয় আজ ফিরতে পারবেন না !"

"ফিরতে পারবেন না ?"

অনুপমা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে রবীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। রবীন্দ্র সে চাহনীর অর্থ বুঝিলেন এবং বলিলেন, "দিদি, তোমার মনে কি কোন সন্দেহ হ'চ্ছে ?"

"আমার বোধ হয় দাদা ডাকাতদের সন্ধানে গেছেন"। এই বলিয়া অনুপমা তাড়াতাড়ি আলমারি খুলিয়া কি যেন অন্বেষণ করিলেন, পাই-লেন না। তখন বলিলেন "রবীনদাদা, আমার অনুমান মিথ্যা নয়, দাদা ডাকাতদের সন্ধানেই গেছেন. আলমারিতে তাঁর 'রিভলভার" নাই।" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—"হেম একলা গেল ?"

"নিশ্চয়ই একলা গেছেন। আমি দাদাকে বেশ জানি, তিনি বড় একবগ্গা। আপনি বসুন—আমি আসচি"। এই কথা বলিয়া অনুপমা ক্ষিপ্রগতিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ আবার চিন্তা-সাগরে ডুব দিলেন।

অনুপমা বাহিরে আসিয়াই একজন পরিচারিকাকে বলিলেন "হীরি, একবার ভীমচাঁদ সর্দ্দারকে ডাক্।" পরিচারিকা "আচ্ছা ডাক্‌চি"

বলিয়া চলিয়া গেল। এই অবসরে অনুপমা শিশুটীকে দুগ্ধপান করাইলেন এবং রন্ধনশালায় যাইয়া রবীন্দ্রনাথের আহার্য্য দিবার জন্য পাচককে আদেশ করিলেন। হেমেন্দ্রবাবুর বাটীতে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকা সত্বেও অধিকাংশ দিন অনুপমা স্বহস্তেই রন্ধন-কার্য্য করিতেন। কোন বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, বিশেষতঃ দ্বাদশীর দিন কাঙ্গালীভোজন প্রভৃতি তাঁহার নিয়মিত কার্য্যে নিয়োজিত থাকিলে অন্নপূর্ণারূপিনী অনুপমা সে দিন আর রন্ধন-কার্য্য করিবার অবসর পাইতেন না। এই কারণে অদ্য তিনি রবীন্দ্রনাথের আহার্য্য দিবার জন্য পাচককে আদেশ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আহার সমাপ্ত হইলে, অনুপমা পুনরায় দরদালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনই ভীমচাঁদ আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল এবং আদেশের অপেক্ষায় যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিল। অনুপমা বলি-বলিলেন, "বাবা ভীমচাঁদ! আমার একটী কাজ কর্‌তে হবে।"

"কি কাজ মা, হুকুম করুন।"

এক্ষণে ভীমচাঁদের একটু পরিচয় দেওয়া আশ্যক। সে জাতিতে চণ্ডাল। সে হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে পাইকের কার্য্য করিত। লোকটী খুব বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত। প্রভুর কার্য্যোদ্ধার করিতে সে সর্ব্বদাই 'মরিয়া'। তাহার পিতা পিতামহ এই বাড়ীতে পাইকের কার্য্য করিত। ভীমচাঁদের আকৃতি যেরূপ অসুরতুল্য, তাহার দেহে শক্তিও তেমনি প্রভূত। লাঠীখেলায় তাহার সমকক্ষ সে অঞ্চলে আর কেহই ছিল না। তাহার হাতে লাঠী থাকিলে সে কাহাকেও ভয় করে না। ভীমচাঁদের কথা শেষ হইলে অনুপমা বলিলেন, "দাদা আজ একলা ত্রিবেণীর জঙ্গলের

দিকে ডাকাতদের আড্ডার সন্ধান কর্ত্তে গেছেন; তুমি গিয়ে দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস! আনতে পার ভাল; কিন্তু যদি তিনি ফিরে না আসেন—তুমি তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর সঙ্গে থেকো,—দেখো বাবা, দাদার যেন কোন বিপদ না হয়।"

"যে আজ্ঞে মা, আমি এখনি গিয়ে বাবুকে ফিরিয়ে আনবো।'

"বেশী অনুরোধ কোরো না, তুই একবার ব'লে দেখলেই বুঝতে পারবে, তাঁর মনের জোর কতখানি। যদি দেখ, শুধু আমার কথায় তিনি একাজ করতে যাচ্ছেন, তাহলে যেমন কোরে পার ফিরিয়ে এনো। আর যদি বোঝ—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এ কার্য্যে হাত দিয়েছেন, তাহলে আর ফেরাবার চেষ্টা কোরো না।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া ভীমচাঁদ প্রস্থানের উদ্যোগ করিলে অনুপমা তাহাকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভীমচাঁদ সে অনুরোধ এড়াইতে পারিল না,—শেষে আহারাদি করিয়া প্রস্থান করিল।

ভীমচাঁদ প্রস্থান করিলে অনুপমা রবীন্দ্রনাথের কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন রবীন্দ্রনাথ নিদ্রিত। নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া অনুপমা একটু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, রবীন্দ্রনাথের অধরোষ্ঠ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে, হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ। অনুপমা ভাবিলেন, রবীন্দ্রনাথ তন্দ্রাবেশে স্বপ্নদর্শন করিতেছেন। কি ভাবিয়া তিনি ডাকিলেন—'রবীন দাদা!"—সুপ্তোত্থিত রবীন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং সবিস্ময়ে বলিলেন—"কে—দিদি?"

"রবীন দাদা, আপনি কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন ?"

"দিদি, সুস্বপ্ন কি কুস্বপ্ন জানি না, কিন্তু সে স্বপ্নের ভাব যেমন মধুর আবার তেমনি তিক্ত, যেমন প্রাণময় আবার তেমনি প্রাণহীন, যেমন সরস আবার তেমনি নীরস।"

"সে কি রবীন দাদা ? এমন কি স্বপ্ন দেখছিলেন যাতে দুটী বিপরীত সম্বন্ধবিশিষ্ট ভাব পরস্পর পাশাপাশি রক্ষিত থাক্‌তে পারে ?"

"অনুপমা, তুমি আমার জীবনের দশ বৎসরের পূর্ব্বের ইতিহাস জান না—আজ তোমায় বলবো,—তা হলেই বুঝতে পার্ব্বে আমার এই স্বপ্নের সঙ্গে তার খুব নিকট সম্বন্ধ।" রবীন্দ্রনাথ সহসা নিরস্ত হইলেন এবং কি চিন্তা করিয়া বলিলেন "অনুপমা তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

"না দাদা, এখনও খাইনি। বাড়ীর সকলের খাওয়া হ'লে তার পর দুটো খাব। যাই স্নান ক'রে দশবার মালা ফিরিয়ে দুটো রাঁধিগে।"

"এর পর রাঁধবে ? বেলা যে একটা বেজে গেছে দিদি ?"

"তাতে কি ? এক-সন্ধ্যে দুটো খাওয়া—যখন হোক হ'লেই হ'ল।"

"যাও দিদি, আর দেরী ক'র না।"

"যাচ্ছি, কিন্তু দাদা, আমি খেয়ে এলে বল্‌তে হবে।"

"হাঁ বলবো—যাও।" অনুপমা প্রস্থান করিলেন।

আহারান্তে অনুপমা প্রত্যাবৃত্ত হইলে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ দিদি, এত শীঘ্র খাওয়া হয়ে গেল ?"

"একপাকে দুটো ভাতে-ভাত রাঁধ্‌তে কতক্ষণ লাগে দাদা ?—এখন আপনার কথা বলুন।"

মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়া অনুপমা শিশুটীকে ঘুম পাড়াইবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ দশবৎসরের অতীত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। এইবার স্বপ্নের কথা। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "দিদি, আজ স্বপ্নে দেখলুম, আরার সেই ভৈরবীমূর্ত্তি। সেই আলুলায়িত-কেশা গৈরিকবসনা যেন ধীরে ধীরে আমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন—'নবীন সন্ন্যাসি, এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তি উপভোগ ক'চ্ছো? চক্ষের সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্য বর্ত্তমান থাকৃতে এমন ধীর স্থির জড়পিণ্ডবৎ অবস্থান ক'চ্ছো? শিক্ষালাভ কর্ত্তে সংসারক্ষেত্রে ফিরে এসেছ; কেবলমাত্র পরিদর্শনে তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, কর্ম্মী হয়ে কর্ম্ম কর্ত্তে হবে। সামান্য বাধাবিঘ্নে বিচলিত হ'য়ো না—পূর্ব্বে তোমায় সে কথা বলেছি। কর্ত্তব্যপথ বন্ধুর হলেও অগ্রসর হতে হবে। সত্য ধর্ম্মপথে প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হ'য়ো না। ধার্ম্মিকের স্বেচ্ছায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ কখনও পাপীর পাপকার্য্যের সহায়তা করবার হেতু হয় না, বরং তা'কে পাপপথ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করে। স্বার্থশূন্য হৃদয়ে পরোপকার কর,—তা'তে যে আনন্দ পাবে, সেই বিমল আনন্দই সাধনার পথের প্রথম আনন্দসোপান। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর,—সাধ্যমত অপরের সাহায্য গ্রহণ করিও না। অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিলে নিজের মনের দৃঢ়তার হ্রাস হ'য়ে যাবে। কোন বিষয়ে পরপ্রত্যাশী হ'য়ো না। সত্যপথে আত্মনির্ভর করিলে দৈব-অনুকম্পা লাভ হয়। সুখের আশা ক'র না, দুঃখের অনুসন্ধান কর।' এই কথা বলিয়া ভৈরবী আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু দিদি তুমি তখনই আমায় জাগাইলে, ভৈরবীর অসমাপ্ত বাক্য আর শোনা হইল না।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "দাদা, ভৈরবীকথিত বাক্যের প্রত্যেকটীই জ্ঞান-

গর্ভ,—এর কোনটুকু নীরস দাদা ? কোনটুকু প্রাণহীন, আর কোনটুকুই বা তিক্ত ?"

"যে প্রকৃত সাধনপথের পথিক তার পক্ষে মধুর ; আর যে আমার মত কার্য্যকারণের বৈপরীত্য হেতু সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধন-পথে অগ্রসর এবং সামান্য বাধাবিঘ্নে যে একাগ্রতা বিসর্জ্জন দিয়ে নৈরাশ্যকে অবলম্বন ক'রেছে, তার নিকট মধুর বলে বোধ হবে কেন অনুপমা ?"

"দাদা, আমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃই অল্পবুদ্ধি এবং জ্ঞানহীনা। আমার মনের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। জগতে যা'কিছু ভাল তা যদি অনায়াসলভ্য হয়—তা' হলে সে জিনিস লাভ কত্তে কারও আগ্রহ হবে না, আর আগ্রহ না থাক্‌লে লব্ধবস্তুর মাধুর্য্য ও উপলব্ধি হবে না। সেই নিমিত্ত সাধন-পথে এত বাধা। বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও ভক্তি—এই তিনটীর অভাব হইলে সাধন-পথের পথিক হওয়া যায় না। গুরুদেবের মুখে শুনেছি সাধনপথের প্রথম সোপানই কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগ সমাপনান্তে জ্ঞানযোগ,—শেষ ভক্তিযোগ। দাদা, সকলের মূল—বিশ্বাস। যার বিশ্বাস নাই সে ত নাস্তিক। আর একটী কথা,—সংসারে কর্ম্মীকে কখনও কর্ম্ম খুঁজ্‌তে হয় না। সংসারে পুণ্যকর্ম্ম বেছে নিতে বা পাপকর্ম্ম পরিহার কর্‌তে—আমার বোধ হয়—অপরের সহায়তা প্রয়োজন হয় না ; নিজের বিবেকই তা দেখিয়ে দেয়।" অনুপমা একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "দাদা, আপনি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন ?

"না,—তুমি বিশ্বাস কর অনুপমা ?"

"যদিও আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না, তবুও আমি বিশ্বাস করি।"

"কেন ?"

"কর্ত্তব্যের অনুরোধে।"

"কি কর্ত্তব্য অনুপমা ?"

"বল্‌ছি—খোকাকে একটু দুধ খাইয়ে দিই, এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে, ঠাকুর-ঘরে আরতির যোগাড় করে দিয়ে আসি"—এই কথা বলিয়া অনুপমা প্রস্থান করিলেন।

শুক্ল-পঞ্চমীর প্রথম যাম উত্তীর্ণপ্রায়। অসংখ্য তারকারাজী, পরিশোভিত সুনীল প্রশান্ত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়া হেমেন্দ্রনাথের বাগানের পুষ্করিণীর কাল জলের উপর যেন একখানি হীরকখচিত কৃষ্ণবর্ণের আস্তরণ বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। কাল জলে কাল আস্তরণ মিশিয়া গিয়াছে। উদ্যানজাত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমবাস হরণ করিয়া সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। সরসীবক্ষে প্রাণপতি শশাঙ্কের ছবি দেখিয়া হাস্যমুখী কুমুদিনী যেন তাহা বক্ষে তুলিয়া লইবার জন্য উৎকন্ঠিতা হইয়া সরসীবক্ষে একবার হেলিয়া পড়িতেছে আবার উঠিতেছে—একবার অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় চেষ্টা করিতেছে। দিবসের কোলাহলে বোধ হয় ভালরূপ সুর জমিবে না ভাবিয়া ঝিল্লিগণ এই শুভ অবসরে স্ব স্ব সুর পঞ্চমে তুলিয়া তান ধরিয়াছে। দূরে ঝাউগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে দুই একটি খদ্যোত মিটি মিটি জ্বলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ উদ্যানের দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে নৈশপ্রকৃতির এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। এমন সময় শিশুটীকে বক্ষে লইয়া অনুপমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুপমা ডাকিলেন—"দাদা!"

"কে—অনুপমা ?"

"দাদা, এখনও আপনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন ?"

"কেন অনুপমা,—এই মাত্র তুমি চলে গেলে, আমিও বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছি।"

"সে কি দাদা, আমি ত সন্ধ্যা হতেই চলে গেছি, এখন যে একপ্রহর রাত হয়ে গেল।"

"বল কি ?"

"হাঁ দাদা, এখন চলুন। খাবার দিয়েছি, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"চল,—হাঁ অনুপমা, তুমি যে কি বলবে বলেছিলে ?"

"বল্‌বো—আগে আপনি খেয়ে নিন।"

"আজ আর বুঝি হেম ফিরবে না ?"

"বলতে পারিনে দাদা—আমি লোক পাঠিয়েছি।"

"বেশ করেছ—হেম একবার—"

রবীন্দ্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন; অনুপমা বাধা দিয়া বলিলেন, "চলুন এখন, ওসব আলোচনা পরে হবে।"

আহারাদি সমাপ্ত হইলে বরীন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন, অনুপমা মেঝের কার্পেটের উপর বসিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌বে বলেছিলে ?

"হাঁ সেই জন্মান্তরবাদের কথা,—আমি দাদা, ওটা বিশ্বাস করি, কেন বিশ্বাস করি, তাও বলি শুনুন। প্রথমতঃ ধরুন, আমার মনে যদি এ ধারণা হয় যে, পরে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, তাহলে স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বের উপর ঘোর অনাস্থা হয়ে যাবে। তার ফলে পাপকর্ম্মে আসক্তি এবং পুণ্যকর্ম্মে ব্যতিক্রম ঘটবে। সুখান্বেষী মানব-প্রকৃতি আপাতমধুর

পাপের পথেই অগ্রসর হবে। তারপর দ্বিতীয় কারণ—গুরুদেবের মুখে শুনেছি, আত্মা অবিনশ্বর। জীবদেহ আধারস্বরূপ, আত্মাই তার আধেয়। এই আধেয়স্বরূপ আত্মার আধার—পরিবর্ত্তনই জন্মান্তর। তৃতীয় কারণ—আমাদের শাস্ত্র। শাস্ত্রে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ আছে। রবীন দাদা, এই তিনটী কারণের জন্যই আমি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করি। এখন আপনি বিশ্বাস ক'রবেন ?"

"অনুপমা, তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস কিছুই নেই, এখন কি বলছিলে—বল।"

"দাদা, জন্মান্তরবাদে যদি আপনার বিশ্বাস হয়, তাহলে সংসারে পাপের পঙ্কিল পথে আর আপনাকে কখনও অগ্রসর হতে হবেনা। আপনার বিবেকই আপনাকে পদে পদে বাধা প্রদান ক'র্ব্বে। ধর্ম্মের পথে কর্ম্মযোগসাধনে আপনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন। কর্ম্মের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মই বাঞ্ছনীয়। গীতায় ভগবান বাসুদেব তাঁর প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনকে ব'লেছেন,—নিষ্কাম কর্ম্মযোগই সংসারীর সাধন-পথের প্রকৃত উপায়। কর্ম্ম কর্‌তে বলেছেন, কিন্তু তার ফলপ্রত্যাশী হ'তে নিষেধ করেছেন।—নিষ্কামভাবে পরের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করাই কর্ম্মযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক সংসারী ব্যক্তির কর্ত্তব্যই তাই। দাদা, আমি স্ত্রীলোক ; ভালমন্দ বুঝিনা ; তবে আমার ধারণা শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে কঠোর সাধনায় একেবারে চরম মুক্তি লাভ অপেক্ষা একাধিক জন্মগ্রহণ ক'রে সংসারে থেকে নিষ্কামভাবে পরহিতে আত্মোৎসর্গ ক'রে অন্তিমে চরমমুক্তিলাভই বাঞ্ছনীয়। দাদা, আপনি কি বলেন ?"

দিদি, তুমি বয়সে নবীনা হইলেও জ্ঞানে প্রবীণা,—আমি অধম—

নিগু'ণ—মূর্খ। জীবনসন্ধ্যা আগতপ্রায়, এখনও কর্ত্তব্যপথ চিনতে পারলুম না"।

"দাদা নৈরাশ্যই সাধন পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ; নৈরাশ্যকে কখনও মনমধ্যে স্থান দেবেন না।"

"অনুপমা"!

"দাদা!"

"তাও কি সম্ভব?"

"নিশ্চয়ই। একাগ্রতাসহকারে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করলে সবই সম্ভব।"

সহসা বাহিরের কোলাহল তাঁহাদের কথোপকথনে বাধাপ্রদান করিল। উভয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে বাড়াণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন দেখিলেন—কতিপয় বাহক কাহাকে বহিয়া লইয়া আসিতেছে অনুপমা ডাকিলেন, "ভীমচাঁদ!"—উত্তর আসিল—"মা"—

অনুপমা রবীন্দ্রনাথকে কিছু না বলিয়া শীঘ্রগতি নীচে নামিয়া গেলেন। সোপানাবলী অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল ; যেন একটা নৈরাশ্যের প্রবলঝটিকা তাঁহার হৃদয়মধ্যে বহিতে লাগিল যেন একটা আকস্মিক শোকের বেগে তাঁহার হৃদয়সরসী আলোড়িত হইয়া উঠিল। অনুপমা সোপান হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন ; দৈবযোগে সোপানসংলগ্ন লৌহদণ্ডের অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ায় পড়িলেন না। নীচে নামিয়া অনুপমা পুনরায় ডাকিলেন—"ভীমচাঁদ!"—সদর দেউড়ি হইতে উত্তর আসিল—"মা"। অনুপমা দেউড়ির দিকে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল, বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। অনুপমা দেখিলেন—ভীমচাঁদের

সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, পরিধেয় বসন রক্তরঞ্জিত, ক্রোড়ে হেমেন্দ্রনাথের রক্তাক্ত দেহ। হেমেন্দ্রের স্কন্ধদেশে তীরফলক আমূলবিদ্ধ। অনুপমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন; তাঁহার মুখ বিশুষ্ক—চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত কিন্তু স্থির—নির্নিমেষ! ভীমচাঁদ শুষ্কমুখে সজলনেত্রে কহিলেন—"মা, এত ক'রেও বাবুকে বাঁচাতে পারলুম না। হায় হায়! এর পূর্ব্বে আমার মরণ হ'লনা কেন?' ভীমচাঁদ ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমা বলিলেন "বাবা, তোমার দোষ নেই, সকলই অদৃষ্টের দোষ;—তুমি তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলে, ভাগ্যদোষে কোন ফল হয় নাই; সেজন্য তোমার দোষ কি?" অনুপমা থামিলেন, কি ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ভীমচাঁদ, তুমি কি ঠিক সময়ে পৌঁছিতে পার নাই?" "মা, তা' যদি পার্‌তাম, তা'হলে এমন হ'বে কেন? নিজের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাক্‌তো বাবুকে বাঁচাতাম্। বল্‌বো কি মা, আমি ত্রিবেণীর জঙ্গলে পৌঁছিয়ে দেখ্‌লাম্, বাবুর ঠিক এই অবস্থা। পোড়া পেটের জন্য সব নষ্ট হ'ল। হায় মা, সে সময় যদি দুটো খাবার জন্য দেরী না কর্ত্তাম্, তা'হলে নিশ্চয়ই বাবুকে বাঁচাতে পার্‌তাম্।"

"যা' হয়ে গেছে তা' আর ফির্‌বে না; এখন উপস্থিতক্ষেত্রে যা' কর্ত্তব্য, তার জন্য প্রস্তুত হও। কান্নাকাটি, হাঁকাহাঁকি কল্লে কোন ফল হবে না। দাদার এরূপ শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ—উপস্থিত এই কয়জন ভিন্ন আর কেউ টের পেলে মহা অনর্থ ঘটবে; এমন কি, রবীনদাদাও যেন ঘুণাক্ষরে জান্‌তে না পারেন। আজ রাত্রের মধ্যেই আমাদের খিড়কির বাগানে গিয়ে লাস জ্বালিয়ে দাও। শ্মশানে নিয়ে গেলে অনেকে দেখ্‌তে পাবে। খুব সাবধান—যাও—আর বিলম্ব ক'রোনা।" ভীমচাঁদ ও তাঁহার তিনজন

সঙ্গী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনুপমার আদেশ পালনের জন্য গমন করিল। অনুপমাও চলিয়া যাইতেছিলেন; আবার কি ভাবিয়া বাগানের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ভীমচাঁদকে ডাকিলেন। ভীমচাঁদ নিকটস্থ হইলে তাহাকে বলিলেন, "দেখ, কাজ শেষ হলে তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেও।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীমচাঁদ প্রস্থান করিল। অনুপমাও উপরে রবীন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। রবীন্দ্রনাথ অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে দিদি? কিসের গোলমাল?"

"ভীমসর্দ্দারের কীর্ত্তি—আপনাকে বলিবার মত কিছু নয়—আপনি ঘুমান—অনেক রাত হয়েছে,—আমিও যাই,' এই কথা বলিয়া মেঝের উপর শায়িত শিশুকে কোলে লইয়া অনুপমা নিজকক্ষে গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন। শিশুকে শয্যায় শয়ন করাইয়া নিজে শিশুর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। হেমেন্দ্রনাথের রক্তাক্ত নিষ্প্রভ বদনমণ্ডল তাঁহার মানসপটে উদিত হইল—শোকের অনিবার্য্য বেগে তাঁহার হৃদয়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহ দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হইল—অনুপমা নিঃশব্দে উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রিয় পাঠক! এদিকে রবীন্দ্রনাথ কি করিতেছেন বা কি ভাবিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য কি আপনার ঔৎসুক্য জন্মে নাই? আসুন, একবার রবীন্দ্রনাথের কক্ষে গমন করি।

বাহিরের কোলাহল শ্রবণ করিয়া, ব্যাপার কি তাহা জানিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বড়ই উৎসুক হইয়াছিলেন। অনুপমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তিনি নিঃশব্দে দেউড়ির দিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিম্নের

ক্ষীণ আলোকে হেমেন্দ্রনাথের মৃতদেহটী দেখিতে পাইলেন বটে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। ভীমচাঁদের অস্ফুট ক্রন্দনও তাহার কর্ণে পৌঁছিল। দারুণ উৎকণ্ঠায় তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির দিকে গেলেন ; কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া, কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; পুনরায় বারান্দায় আসিলেন,—দেখিলেন লাস অন্তর্হিত, দূরে বাগানের দিকে সেই ক্ষীণ আলোকটী দেখা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিলেন। অবশেষে চিন্তিতমনে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্থিরভাবে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। অবিলম্বেই অনুপমা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উৎসুক হইয়া অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যেরূপ উত্তর পাইলেন এবং তৎকালীন অনুপমার মুখের ভাব যেরূপ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল। অনুপমা কক্ষ হইতে বহির্গত হইলে রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন এবং সোপান অবতরণ করিয়া খিড়কির বাগানের দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উদ্যানাভ্যন্তরে একটি আলোক দেখিলেন। তিনি সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। নিকটস্থ হইয়া একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিলেন, কতিপয় লোক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে কিছু দগ্ধ করিতেছে ;—অনুমানে বুঝিলেন যে তিনি ইতিপূর্ব্বে যে মৃতদেহটী দেখিয়াছিলেন, ইহারা তাহাই দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু এ মৃতদেহ কা'র ? রবীন্দ্রনাথ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই! এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। প্রজ্বলিত অনল ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাপিত হইল—লোকগুলি চলিয়া গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এতবড় একটী ব্যাপার সংঘটিত হইল,—রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিয়াও কিছুই জানিতে পারিলেন না।

[৬]

চিতা নির্ব্বাপিত হইল বটে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অগ্নি কে নির্ব্বাণ করিবে? রবীন্দ্রের উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইল; ভাবিলেন, এ মৃতদেহ কা'র? ইহারাই বা কে? ইহাদের সহিত হেমেন্দ্রের কোন সংস্রব আছে কি না? কেনই বা মৃতদেহটী শ্মশানে না লইয়া গিয়া হেমেন্দ্রনাথের উদ্যানে দগ্ধ করিল? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় রবীন্দ্রনাথকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তিনি হেমেন্দ্রের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, কি এই বিষয়টীর প্রকৃত তথ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন? রবীন্দ্রের অনুসন্ধিৎসু হৃদয় দ্বিতীয়টীর দিকে আকৃষ্ট হইল। রবীন্দ্র উদ্যানের যে স্থানে শবদাহ হইয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন, দুই একটী অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ভিন্ন সেখানে আর কিছুই নাই। চিন্তিতমনে সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি একটী বস্তুর উপর পতিত হওয়ায় তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তাপদগ্ধ তৃণাবলীর মধ্যে একটী সুবর্ণের অঙ্গুরী। অঙ্গুরীটী লইয়া চন্দ্রালোকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন দেখিলেন—অঙ্গুরীটীতে পারসী ভাষায় একটী সাঙ্কেতিক নাম লেখা। পারসীভাষায় রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং অঙ্গুরীতে লিখিত নামটী পড়িতে পারিলেন না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অঙ্গুরীটী নিজহস্তে পরিয়া রবীন্দ্রনাথ উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গ্রাম্যপথ পরিত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ মাঠের পথ ধরিয়া ত্রিবেণীর জঙ্গলের দিকে চলিলেন।

স্তব্ধ নিশীথরাত্রে জঙ্গল অতিক্রম করিতে করিতে সীমান্তে একটী পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি সেই দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সেই জীর্ণ অট্টালিকামধ্যে একটী ক্ষুদ্র আলোকের ক্ষীণরশ্মি তাঁহার নয়নগোচর হইল। রবীন্দ্র সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে তিনি সেই ভগ্ন অট্টালিকার সমীপবর্ত্তী হইলেন। দূর হইতে যে আলোকটী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, নিকটে আসিয়া সে আলোকটী দেখিতে না পাইয়া রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। সহসা যামিনীর গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোমল-কামিনী-কণ্ঠনিঃসৃত মধুর-সঙ্গীতলহরী সেই জনশূন্য অরণ্যভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের বিস্ময় দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। মধুর কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া পরিশেষে সপ্তমে উঠিল। উদারা-গ্রামে আবদ্ধ সুর তারা-গ্রামে উঠিল। রবীন্দ্রনাথ শুনিলেন—

"নীরব ধরণী, নীরব যামিনী,
কেন কুলুধ্বনি তটিনী গাও?
কি বেদনা বল তোমার হৃদয়ে,
কাহার লাগিয়ে ছুটিয়ে যাও?
অঙ্গেতে মাখিলে স্নিগ্ধ জোছনা
যাবে কি বেদনা বলনা বলনা?
আমি প্রবাহিনী জনম-দুখিনী,
আমা'পানে বারেক ফিরিয়া চাও।

মন্দ মন্দ বয় মলয় পবন
বাড়াইতে শুধু হৃদয়-দহন
কোকিল-কূজন যাতনা কারণ,
কেন লো তাদের সাথে নিয়ে যাও ?"

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকারিণীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। মনে নানারূপ চিন্তা! এই নীরব নিশীথে, জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে কে এই সুধাকণ্ঠী রমণী! রবীন্দ্রনাথ সেই ভগ্ন অট্টালিকার চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া একদিকের ইষ্টকস্তুপের পার্শ্বে একটী ভগ্নাবশেষ দ্বার দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে সেই ভগ্নদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে তাঁহার বড় ভয় হইতে লাগিল। একবার অগ্রসর হন, আবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মনে ভাবিলেন, এই স্থান নিশ্চয়ই দস্যুদিগের আড্ডা। একবার প্রতারণা করিয়া দস্যুহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, পুনরায় তাহাদের হস্তে পতিত হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথ! এই সাহস লইয়া তুমি দস্যুহস্ত হইতে দুইটী হতভাগিনী রমণীর উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছ ? ভৈরবীর উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আজ নশ্বর জীবনের মমতায় স্বীয় কর্ত্তব্যপথ হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইয়াছ ? সংসার-অনাসক্ত সন্ন্যাসীর কি এই কর্ত্তব্য ? অগ্রসর হও রবীন্দ্রনাথ ; নশ্বর জীবনের মমতায় নিজের কর্ত্তব্য জলাঞ্জলি দিও না। তুমি কি জান না—জন্ম হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য ? একদিন কি মরিতে হইবে না ? বিবেকের এবম্প্রকার উৎসাহ-বচনে রবীন্দ্রনাথ অবশেষে সাহসে ভর করিয়া সেই ভগ্নদ্বার দিয়া জীর্ণ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বার অতিক্রম করিয়া দেখিলেন---সম্মুখে ভয়ানক অন্ধকার, পথ দেখিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ ভগ্ন প্রাচীর গাত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া প্রাঙ্গণে আসিলেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না;—সহসা উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটী গবাক্ষদ্বার হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে যে আলোক দেখিয়াছিলেন, ইহা সেই আলোক। উপরে যাইবার জন্য সোপানের অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ একটী ভগ্নদ্বারের প্রলম্বিত কাষ্ঠখণ্ড মস্তকে লাগিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল, এবং সেই সঙ্গে একটী বৃহৎ লম্বমান লৌহশৃঙ্খল আন্দোলিত হইয়া পুরাতন লৌহকবাটে সজোরে স্পৃষ্ট হওয়ায় ঝনাৎ করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে যে গবাক্ষদ্বার হইতে আলোকরশ্মি দৃষ্ট হইতেছিল সেই গবাক্ষদ্বারটী রুদ্ধ হইল। অনতিবিলম্বে অদূরবর্ত্তী সোপান অবতরণের খট্ খট্ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে একটী বিশালকায় মনুষ্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথ তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাহার নির্ম্মমহস্তের দৃঢ় আকর্ষণে অবিলম্বেই তিনি তাহাকে দস্যু বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। দস্যু রবীন্দ্রনাথের হস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া একটী অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার হস্তত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া একলম্ফে কক্ষের বাহিরে আসিল। স্বশব্দে কক্ষদ্বার বহির্দ্দেশ হইতে রুদ্ধ হইল। রবীন্দ্রনাথ দস্যুহস্তে পুনরায় বন্দী হইলেন।

রোগে, শোকে, সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় মানবমাত্রেরই চিন্তা একমাত্র সহচরী। রবীন্দ্রনাথও চিন্তামগ্ন। দস্যুহস্তে পুনঃপতিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে কখনও আত্মহারা হইতেছেন, অমনি সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। আবার পরমুহূর্ত্তে সেই দস্যুহস্তে বন্দিনী দুইটী হতভাগিনীর কথা হৃদয়ে জাগরূক হইয়া তাঁহাকে পুনরায় কর্ত্তব্যের পথে ফিরাইয়া দিতেছে। এইরূপ দারুণ উৎকণ্ঠা, ভয় ও যন্ত্রণায় রাত্রি প্রভাত হইল। উষার ক্ষীণ আলোক সেই ক্ষুদ্রঘরের গবাক্ষপথে আসিয়া রবীন্দ্রের নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে আশার ক্ষীণ আলোক জ্বালিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন। ক্ষীণ দিবালোকে যতদূর সম্ভব কক্ষটী দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—কক্ষটী অতিশয় জীর্ণ, দেওয়ালের চূণ বালী অধিকাংশ খসিয়া গিয়াছে; এককোণে ছাদে একটা অশ্বত্থবৃক্ষ হওয়ায় তাহার শিকড় ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে। ঘরটী খিলানে প্রস্তুত। ছাদের অনেক স্থানের চূণ বালী খসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ঊর্ণনাভের বৃহৎ বৃহৎ জাল; মেজে আবর্জ্জনাপূর্ণ। ফলতঃ কক্ষটী দেখিলে বোধ হয় যে, ইহাতে বহুকাল হইতে লোকের বাস নাই। রবীন্দ্র গবাক্ষদ্বার দিয়া বাহিরের বস্তু দর্শন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অনেক উচ্চে বলিয়া সক্ষম হইলেন না। অবশেষে তিনি দ্বারের নিকট আসিলেন, এবং নিষ্ফল জানিয়াও স্বাভাবিক ঔৎসুক্যবশতঃ দুইহস্তে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন; দ্বার খুলিল না। একে রোগক্লিষ্ট, তাহাতে আবার রাত্রির পরিশ্রমে অবসন্ন রবীন্দ্রনাথ মেজের উপর আসিয়া উপবেশন করিলেন। এইরূপে কতক্ষণ অতিবাহিত হইল। রবীন্দ্রনাথ সেই এক ভাবে বসিয়া বিপদের

একমাত্র বন্ধু বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতেছেন, আর অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

সহসা কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, একটী বৃদ্ধা কিছু খাদ্যসামগ্রী লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহা রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে রাখিয়া একটী মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ পানীয় জল রাখিয়া দিল এবং কক্ষদ্বার পুনরায় রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। রবীন্দ্রনাথ ক্ষুধাসত্ত্বেও সেই কদর্য্য আহার্য্যদ্রব্যের কিছুমাত্র গ্রহণ করিলেন না, যে ভাবে বসিয়াছিলেন সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

তপনদেব যথাসময়ে উদিত হইয়া আবার যথাকালে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রকক্ষে আবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

[৭]

বেলা ৭টা বাজিয়াছে। ভীমচাঁদ প্রত্যূষে উঠিয়া হেমেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসিয়া অনুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সদর দেউড়ীতে অপেক্ষা করিতেছে। অনুপমা আজ এখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। কতক্ষণ পরে অনুপমা বাহিরে আসিলেন। লাবণ্যময়ী অনুপমা সুন্দরীর আজ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! তাঁহার বদনমণ্ডল শুষ্ক, নয়নকোণে কালিমারেখা অঙ্কিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, দৃষ্টি উদাস, অধরোষ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া স্পন্দিত হইতেছে। শিশুকে বক্ষে লইয়া অনুপমা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলে পরিচারিকা হীরামণি বলিল, "মা, ভীমে সর্দ্দার আপনার সঙ্গে দেখা কর্ব্বে ব'লে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।"

"কোথায় আছে ?"

"দেউড়ীতে—ডেকে দোব ?"

"আচ্ছা ডাক্।" হীরামণি ভীমচাঁদকে ডাকিয়া আনিল। ভীমচাঁদ উপস্থিত হইলে অনুপমা বলিলেন, 'ভীমচাঁদ, কি মনে ক'রে ?"

"আপনি কাল রাত্রে ফেরবার সময় দেখা ক'র্ত্তে ব'লেছিলেন; আমি এসেছিলাম, আপনার সাড়া না পেয়ে ফিরে গেলাম। মনে ভাবলাম্ বুঝি খুব দরকারী কাজ আছে, তাই আজ ভোরেই এসেছি।"

অনুপমা কি চিন্তা করিয়া ব'লিলেন. "হাঁ, বিশেষ প্রয়োজন আছে,—আচ্ছা, আমি শুন্‌লুম্ গঙ্গার ঘাটে কাল সন্ধ্যার সময় দু'খানা বজ্‌রা লেগেছে; বল্‌তে পারো—বজ্‌রা দু'খানা কা'র ?"

"আমি ত দেখিনি মা,—বাদসার নয় ত ?"

"তুমি সন্ধান নিয়ে এস, খুব শীঘ্র আসবে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" ভীমচাঁদ প্রস্থান করিলে, অনুপমা একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটী দেরাজ খুলিয়া তন্মধ্য হইতে হেমেন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত একখানি চিঠির কাগজ বহির করিলেন এবং মসীপাত্র লইয়া লিখিতে বসিলেন। কয়েক ছত্র লিখিয়া, বোধ হয় লেখা মনোমত হইল না ভাবিয়া, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পুনরায় আর একখানি বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাও মনোমত হইল না—ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; ইতিমধ্যে ভীমচাঁদ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডাকিল, 'মা"—

"যাই" বলিয়া অনুপমা নীচে নামিয়া আসিলেন। ভীমচাঁদ বলিল, "মা, গঙ্গার ঘাটে সত্যই দু'খানা বজ্‌রা লাগিয়াছে; বজ্‌রা দু'খানা বাদসার। কতকগুলি সৈন্য নিয়ে একখানিতে মহারাজ মানসিংহের পুত্র

জগৎসিংহ, আর অপরখানিতে দলবল নিয়ে একজন মুসলমান সেনাপতি আছেন।"

"হুঁ—বজ্‌রায় কোন স্ত্রীলোক আছে কি বুঝ্‌লে?"

"মা, আপনি ঠিক অনুমান করেছেন; আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। তার পর বজ্‌রার একজন মাঝির কাছে সন্ধান নিয়ে জানিতে পার্‌লাম যে, আমাদের সম্রাট্‌-নন্দিনী মেহেরউন্নিসা বজ্‌রায় আছেন।

"সম্রাট্‌-নন্দিনীর এরূপভাবে আসার উদ্দেশ্য কি? কিছু জানতে পারলে?"

"না মা"।

"যাক্‌, যে উদ্দেশ্যই আসুন, সে সব ভাব্‌বার প্রয়োজন নেই। আমি একবার সম্রাট-দুহিতার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাই। জানি, বাদসাজাদীর সাক্ষাৎকারলাভ একেবারে অসম্ভব না হ'লেও বড়ই কঠিন। যতই কঠিন হোক, ভীমচাঁদ, আমি সাক্ষাৎ কর্ব্বো। তোমায় একটা কাজ করতে হবে; আমার একখানি পত্র নিয়ে যেতে হবে,—যেমন ক'রে হোক সে পত্র সাহাজাদীর হস্তে পড়া চাই। তাঁর হাতে পড়্‌লে নিশ্চয়ই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ভীমচাঁদ পার্ব্বে?"

"নিশ্চয়ই পার্ব্বো মা—না পারি আর ফির্‌বো না।"

"বাবা ভীমচাঁদ, তোমার কথায় হৃদয়ে দ্বিগুণ সাহস পেলাম। অনেকটা আশ্বস্ত হ'লাম। এ সংসারে আমার আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই। একমাত্র অভিভাবক ছিলেন দাদা; অদৃষ্টচক্রে তাঁকেও অকালে হারালাম। পতি-পুত্রহীনা রমণী এ বিশাল সংসারে আজ

একাকিনী। ভীমচাঁদ, তুমি আমাদের হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছ ; এ অসময়ে তুমিও যেন ত্যাগ কোরো না।”

“মা, কি বলছো ?—ভীমে অস্পৃশ্য চণ্ডাল হলেও সে তোমাদের নেমক খেয়ে মানুষ,—প্রাণ থাকতে কখনো নেমকহারামী কর্ব্বে না। মা, আমার ছেলে পুলে নেই, তোমরা আছ বলেই আজও আমি সংসারে আছি, নইলে এতদিন কোথায় চলে যেতাম—কেউ সন্ধান পেত' না। মা, তুমি চিঠি লেখ—আমি চট্ ক'রে বাড়ী থেকে গামছাখানা আর লাঠীগাছটা নিয়ে আসি।” এই কথা বলিয়া ভীমচাঁদ প্রস্থান করিল এবং অনুপমা পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লেখা সমাপ্ত হইতে না হইতে ভীমচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুপমা পত্রখানি খামে মুড়িয়া ভীমচাঁদের হস্তে দিলেন এবং সম্রাটনন্দিনীর জন্য উপঢৌকন স্বরূপ কয়েকটী মূল্যবান দ্রব্য প্রদান করিয়া ভীমচাঁদকে বিদায় করিলেন।

বজ্‌রার খাস কামরায় বসিয়া কুমার জগৎসিংহ মনোযোগের সহিত একখানি নক্সা দেখিতেছিলেন ; তাঁহার সম্মুখস্থ মেজের উপর অর্দ্ধসমাপ্ত একখানি পত্রিকা এবং তৎপার্শ্বে মসীপাত্র। কুমার জগৎসিংহ একটী রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর কলমের এক অংশ দুইটী অঙ্গুলী সাহায্যে ধরিয়া অপরাংশ অধরোষ্ঠের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়াছেন। চিন্তাভারে তাঁহার প্রশান্ত ললাটদেশ কুঞ্চিত, দৃষ্টি ধীর—স্থির। ভীমচাঁদ কামরায় প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। কুমার জগৎসিংহ ভীমচাঁদকে দেখিতে পাইলেন কি না বলিতে পারি না, তবে তাঁহার ভাব দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, তিনি দেখিতে পান নাই ; কারণ তিনি পূর্ব্ববৎ নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া রহিলেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর কুমার জগৎসিংহ

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার অধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অধরোষ্ঠ ঈষৎকম্পিত হইয়া একটী অস্ফুট বাক্য নিঃসৃত হইল; কুমার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ভীমচাঁদকে সম্মুখে দেখিয়া বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" ভীমচাঁদ পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "হুজুর অধীনকে আপনার গোলাম ব'লেই জানবেন।"

"তোমার প্রকৃত পরিচয় কি?"

"আমি এখানকার জমিদার হেমেন্দ্রনাথ রায়ের একজন সামান্য ভৃত্য

"তুমি এখানে কিরূপে এলে? কেউ তোমায় বাধা দিলে না?'

"হুজুর, গোলামকে মাপ করবেন। আমি আমার মনিবের আদেশে আপনার কাছে এসেছি। হুজুরের বজ্‌রায় বোধ হয় এমন কেউ নেই যে আমায় বাধা দেয়। দুইজন হতভাগ্য সৈনিক আমায় বাধা দিতে এসেছিল, কিন্তু পারেনি। তারা এখন মূর্চ্ছিত অবস্থায় 'কায় প'ড়ে আছে। আর কোন বাধা পাইনি।"

"তুমি বঙ্গদেশবাসী তোমার যে এতটা সাহস, এটা তোমার পক্ষে একটা গৌরবের বিষয়। তুমি গুরুতর অপরাধ করেছ এবং অপ-রাধের জন্য তুমি ন্যায়তঃ দণ্ডনীয়; কিন্তু আমার কাছে সাহসী ও সত্য-বাদীর পুরস্কার আছে। তোমায় আমি দণ্ড দোব না; তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।"

"হুজুর, কোন সূত্রে আমার মনিব শুনেছেন যে, এই ছিপে আমাদের সম্রাট্‌নন্দিনী আছেন। তাই তিনি তাঁর সম্মানের জন্য এই যৎসামান্য

সওগাত আর এই পত্র পাঠিয়েছেন। ধর্ম্মাবতার, আমি তাই তাঁকে দেবার জন্য নিয়ে এসেচি।"

কুমার জগৎসিংহ কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে কি চিন্তা করিলেন। পরিশেষে বলিলেন—"উত্তম, আমার সঙ্গে এস'।"

কুমার জগৎসিংহ ভীমচাঁদকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট্-নন্দিনী মেহেরউন্নিসার কক্ষের নিকট গমন করিয়া একটী ঘণ্টাধ্বনি করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে একজন বাঁদী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। জগৎসিংহ ভীমচাঁদকে বলিলেন, "তোমার মনিবের প্রেরিত সওগাত ও পত্র ইহাকে দাও, তাহা হইলেই সম্রাট্-নন্দিনী পাইবেন।"

কুমারের আদেশমত ভীমচাঁদ বাঁদীর হস্তে পত্রিকা ও সওগাত প্রদান করিল। অতঃপর কুমার তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপন কক্ষাভিমুখে চলিলেন। সহসা সৈনিকগণের কোলাহল শুনিয়া তিনি স্বীয় কক্ষে প্রবেশ না করিয়া, যেখানে কোলাহল হইতেছিল সেইদিকে গেলেন, ভীমচাঁদও তাঁহার অনুগমন করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বজ্‌রা-সংলগ্ন একখানি নৌকার মধ্যে তাঁহারই অধীন ৭।৮ জন সৈনিক কোলাহল করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি বংশীধ্বনি করিয়া জনৈক হাওলদারকে আহ্বান করিলেন। হাওলদার বলিল, "খোদাবন্দ, জলদস্যু আমাদের পেছনে লেগেছে, আমাদের দুইজন সৈনিককে একেবারে ঘাল করেছে; তাহাদের জীবনের আশা খুব কম।" কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুগণ কখন্ আক্রমণ ক'রেছিল?—আমি ত কিছুই জানিতে পারি নাই!"

"নৌকায় তখন ঐ দুইজন খাটাদার ভিন্ন আর কেউ ছিল না ; এমন কি আমিও সংবাদ পাই নাই।"

"দস্যুরা কতজন ছিল ?"

"তাও বল্‌তে পারি না খোদাবন্দ্‌।"

"হুঁ—বুঝেছি। যাও—আর গোলমাল কোরো না"—এই কথা বলিয়া ভীমচাঁদের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং পুনরায় হাবলদারকে বলিলেন, "দেখ, যাতে লোক দু'টো বাঁচে তার চেষ্টা করগে।"

হাবলদার প্রস্থান করিল এবং কুমার জগৎসিংহ ভীমচাঁদকে সঙ্গে লইয়া খাস কামরায় ফিরিয়া আসিলেন।

কুমার জগৎসিংহ ভীমচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার মনিবের নাম কি বল্‌লে ?

"হুজুর, আমার মনিবের নাম হেমেন্দ্রনাথ রায়।"

"তুমি তাঁর বাটীতে কতদিন আছ ?"

"শুধু আমি নই হুজুর, আমার বাপ-দাদাও ঐ বাড়ীতে চাকরী ক'রে মরে গেছে।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে।"

"হুজুর কি গোলামকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে চান ?"

"না—তা' নয়। আমার কাছে চাকরী করবে ?"

"তা পার্ব্বো না হুজুর। আমরা জেতে ছোটলোক হলেও বাবুর নুণ খেয়েছি—যদি চাকরি করি ত বাবুর বাড়ীতেই করবো,—প্রাণ থাক্‌তে আর কোথাও যাব না।"

"একান্তই যাবে না? তোমায় যদি প্রচুর অর্থ দিই?"

"মাপ কর্ব্বেন হুজুর! আমরা ছোটলোক, কোনরূপে দু'বেলা দু'মুঠো পেটের ভাত জুটলেই হ'লো। অর্থই সর্ব্বনাশের মূল—অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। দেখুন, আমাদের অর্থ নেই ব'লে এখনও পাঁচজন জ্ঞাতি কুটুম্ব নিয়ে মনের সুখে আছি। অর্থ থাক্‌লে তা হ'ত না—আপোষে ঝগড়া দাঙ্গা মারামারি ক'রে মর্‌তাম—এতটা মনের মিল থাকতো না। যদিও আমার ছেলে পুলে নেই, তবুও আমার ভাইপো ভাগ্নে পাঁচটী আছে। তাদের নিয়ে বেশ আছি। অর্থ থাক্‌লে তারা সব পর হয়ে যেত'।"

"তোমার নাম কি?"

"হুজুর গোলামের নাম ভীমচাঁদ সর্দ্দার।"

এমন সময়ে বাঁদী আসিয়া কুমার জগৎসিংহের হস্তে একখানি পত্রিকা প্রদান করিল। কুমার তাহা পাঠ করিয়া ভীমচাঁদকে বলিলেন—"সর্দ্দার, বাদসাজাদী তোমার মনিবের প্রর্থনা মঞ্জুর ক'রেছেন। হেমেন্দ্রবাবুর ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি স্বীকৃতা। এই আমার নামাঙ্কিত পত্র নাও—তাঁকে দিও। আসবার সময় তিনি যেন এখানি সঙ্গে আনেন; আবশ্যক হ'লে বজ্‌রার যে কোন ব্যক্তি দেখ্‌তে পারে। আর একটী কথা, ব'লো আজ রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে তিনি যেন আসেন; কারণ রাত্রি দশটার পর আমাদের বজ্‌রা খুলতে আদেশ দিয়েছি। এখন তুমি যেতে পারো।" ভীমচাঁদ পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং পত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

যথাকালে ভীমচাঁদ অনুপমার হস্তে পত্র প্রদান করিলে অনুপমা

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি আজ আমার মহৎ উপকার করলে।"

[৮]

"কুল—কুল—কুল। পতিতপাবনী সুরধুনি! এই অব্যক্ত-মধুর শব্দের অর্থ কি মা? দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিরত তোমার ঐ একই শব্দ। এ শব্দ আনন্দজনিত কি দুঃখজনিত---আমায় ব'লে দাও না মা? দিবারাত্রি এক ভাবে ছুটিতেছ, তাই কি মা শ্রান্তি বশতঃ ডাকিতেছ কুল--কুল---কুল! যদি তুমি এতই শ্রান্ত, তবে বিশ্রাম কর না কেন? শ্রান্ত হ'লে কি কেহ তোমার মত অসংখ্য তরণীমালা বক্ষে লইয়া, উর্ম্মিভুজে দোলাইতে দোলাইতে ছুটিয়া যাইতে পারে? বুঝেছি মা, তুমি চিদানন্দময়ী, তোমার এ কুলুধ্বনি দুঃখের নয়—আনন্দের। বল মা, তোমার এত আনন্দ কিসের? আমার দুঃখে তোমার প্রাণ কি কাঁদে না মা?"

লাল পশ্চিমে আকাশে যখন লাল সূর্য্য একটু একটু করিয়া অদৃশ্য হইতেছিল, তখন একটী সুন্দরকান্তি তরুণযুবক ত্রিবেণীর ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া এরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় আর একজন বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি আসিয়া সেই তরুণ যুবকের পার্শ্বে দাঁড়াইল। যুবক আগন্তুকে দেখিয়া কহিলেন, "ভীমচাঁদ, এত বিলম্ব হ'ল কেন?"

"মা, এ বেশে আমি আপনাকে চিন্তে পারিনি! অনেকক্ষণ এসেছি, এতক্ষণ আপনার সন্ধান কচ্ছিলাম।"

"না চেনবারই কথা, আমার উদ্দেশ্যও তাই। কেন মা, হেমেন্দ্রনাথ রায়ের ভগ্নী আজ একাকিনী প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হয়েছে—এ কথা যাতে লোক-সমাজে প্রকাশ না হয়, এই আমার ইচ্ছা। এখন বুঝেছ ভীমচাঁদ, আমার এরূপ ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য কি?"

"বুঝেছি মা,—কিন্তু একটা কথা, আপনি এ বেশে গেলে যদি বজরার লোক সন্দেহ ক'রে, আপনাকে সম্রাট্‌নন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে না দেয়, তখন কি কর্ব্বেন?"

"সে চিন্তা পরে। এখন চল বজরায় যাওয়া যাক্।"

উভয়ে বজরায় আরোহণ করিলে জনৈক প্রহরী আসিয়া বলিল, "আপ্ লোগ্ কোন হ্যাঁয়? কাঁহাসে আতেঁ হ্যাঁয়?"

প্রহরীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া অনুপমা কুমার জগৎসিংহ প্রদত্ত পত্রখানি তাহার হস্তে দিলেন।

"আপলোগ্ এঁহা খাড়া রহিয়ে হাম্ আতে হেঁ" বলিয়া প্রহরী পত্র লইয়া প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "আপলোগ্ মেরে সাথ আইয়ে"! প্রহরী অগ্রে গমন করিল, তাঁহারা উভয়ে তাহার অনুসরণ করিলেন।

সম্রাট্-নন্দিনীর কামরায় সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রহরী ঘণ্টাধ্বনি করিলে অবিলম্বে একটী বাঁদী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রহরী বাঁদীর হস্তে পত্রিকা প্রদান করিল এবং বাঁদী পত্র লইয়া সেই কামরায় প্রবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে বাঁদী বাহিরে আসিয়া অনুপমাকে ডাকিল। অনুপমা বাঁদীর সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সম্মুখে অকস্মাৎ ভীষণ অজগর দর্শনে মানুষ যেমন চমকিত হয়,

যুবকবেশে অনুপমাকে দেখিয়া সম্রাট্-নন্দিনী মেহেরুন্নিসা ততোধিক চমকিত হইলেন এবং রোষকষায়িতলোচনে বাঁদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একটী বাক্য নিঃসৃত হইল না। তদ্দর্শনে অনুপমা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং মনে মনে আপনার ছদ্মবেশ ধারণের নৈপুণ্যের জন্য বড়ই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কি জানি, পাছে এবম্প্রকার কৌতুকের ফল বিষময় হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় অনুপমা প্রথমেই কথা কহিলেন,—ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সম্রাট্-নন্দিনি! আমায় ক্ষমা কর্বেন, আমি পুরুষ নই। বিশেষ কোন কারণবশতঃ আমি এইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করেছি।" অনুপমা তাঁহার মাথার পাগড়া খুলিয়া ফেলিলেন,—অমনি নিবিড়-জলদ-জালনিভ ঘন-কৃষ্ণকেশরাশি প্রলম্বিত হইয়া নিতম্বদেশ চুম্বন করিল। তদ্দর্শনে মেহেরুন্নিসার সন্দেহ দূর হইল; ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাঙ্গালা দেশের মেয়ের যে এতদূর বুদ্ধি আছে তা আমি জানতাম না। সত্যই আপনার বুদ্ধি প্রশংসার যোগ্য।"

"সম্রাট্-নন্দিনি! আজ বড় বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপদে বিপদে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা হ'য়ে যদি ভারতসম্রাট্ সন্তানতুল্য দীন প্রজাদের না দেখেন, তাদের গগনভেদী কাতর ক্রন্দনে যদি কর্ণপাত না করেন, তা'হ'লে তারা কা'র কাছে দাঁড়াবে? কা'র কাছে তাদের যন্ত্রণার কথা জানাবে? আপনি কোমলতার আধার-রূপিণী স্নেহশীলা নারী;—পরের দুঃখে নারীহৃদয় অতি সহজেই দ্রবীভূত হ'য়ে স্নিগ্ধস্নেহের সরসী উথলে উঠে, এবং দুঃখ দূরীকরণের জন্য সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্র হয়ে উঠে; তাই আজ আপনার ন্যায় করুণাময়ী নারীর আশ্রয়

নিতে এসেছি। দীনা, অনাথিনীকে ভগ্নী ব'লে আপনার মধুর অভয়-বাণীতে আশ্বাসিত করুন।" অনুপমা আর বলিতে পারিলেন না; তিনি সম্রাট্-নন্দিনী-সমীপে নতজানু হইয়া উপবেশন করিয়া অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মেহেরুন্নিসার কোমলহৃদয় বিগলিত হইল। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং অনুপমার হাত দুখানি ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "নিশ্চিন্ত হও বো'ন! আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যদি সাধ্যাতীত না হয়, তাহ'লে আমি তোমার দুঃখ দূর কর্ব্বো। বল বো'ন, তোমার দুঃখের কারণ কি।"

"বাদ্‌সাজাদি, আপনার সাধ্যাতীত হ'লে আপনার কাছে আসতেম্ না। যখন অভয় পেয়েছি, তখন সবই আপনাকে বল্‌বো"—এই বলিয়া অনুপমা রবীন্দ্রনাথের দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার ব্যাপার হইতে হেমেন্দ্রনাথের আকস্মিক দস্যুহস্তে শোচনীয় মৃত্যুব্যাপার পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা বাদসাজাদীর নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন।

সম্রাট্-নন্দিনী স্থিরচিত্তে সমুদয় শুনিয়া কহিলেন, "বো'ন, তুমি নিশ্চিন্ত-মনে গৃহে গমন কর; আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যেরূপে পারি দস্যুদলকে দমন কোর্ব্বো; আর যদি সেই দুটি অভাগিনী রমণী আজও জীবিতা থাকে, তাহলে তাদেরও উদ্ধার কর্ব্বো।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি তবে আসি,—দেখ্‌বেন, দুঃখিনী ভগ্নী ব'লে যেন মনে থাকে"—এই বলিয়া অনুপমা গমনোদ্যতা হইলে মেহেরুন্নিসা বলিলেন, "শোন ভগ্নি, তুমি এ বেশ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক বেশে গমন কর; আমি যান বাহনের বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। কি জানি, ছদ্মবেশে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।"

"আসবার সময় ত কোনরূপ অসুবিধা ঘটেনি !"

"সেটা তোমার সৌভাগ্য ; তা বলিয়া অনিশ্চয় বিষয়ে ভরসা করা উচিত নয়।" মেহেরুন্নিসার বিম্বাধরে ক্ষণিকের জন্য একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

[৯]

চিন্তায় অবসাদে রজনীর দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইল। দস্যুহস্তে বন্দী রবীন্দ্রনাথ ঠিক একভাবেই বসিয়া আছেন। ক্ষুদ্র কক্ষটী নিবিড় অন্ধকারময়। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, কেবল মাত্র মশকের অব্যক্তধ্বনি কক্ষটীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সহসা আবার সেই রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত-লহরী ! রবীন্দ্রনাথের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। মন্দপবন সেই মধুর সঙ্গীত-লহরী ধীরে ধীরে নাচাইতে নাচাইতে দূরে—দূরে—আরও দূরে—ক্রমে কোন অনির্দ্দিষ্ট দূরবর্ত্তী স্থানে বহিয়া লইয়া গেল। আবার ধরণী গভীর নিস্তব্ধতার কোলে ডুবিয়া গেল। সহসা রবীন্দ্রনাথ দ্বারে খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্বারের নিকট গিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। রবীন্দ্র-নাথ মনে করিয়া ছিলেন—এই নীরব নিশীথে দস্যুদল তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত। কিন্তু একি ! এ যে ভীষণদর্শন দস্যুর পরিবর্ত্তে—এক অলোকসামান্যা—রূপবতী কিশোরীমূর্ত্তি ! রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। রমণী সুন্দরী। তার নিতম্বচুম্বিত অবেণীবদ্ধ কেশরাশি ঘনকৃষ্ণ, বাহুযুগল সুগোল, করাঙ্গুলী চাঁপার কলির মত কি না বলিতে পারি না, তবে সুন্দর রক্তাভ। কটীদেশ ক্ষীণ হইলেও

পবনভরে ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয় নাই। চক্ষুযুগল ঠিক পটল-চেরা না হইলেও অনেকের গৃহিণীর মত পটলচেরা নয়,—বড় বড়—আকর্ণবিশ্রান্ত। পদ্মের উপর ভ্রমর দেখিয়াছেন কি? এই রমণীর চক্ষুযুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনেকটা ধারণা হইবে। নাসিকা ঠিক বাঁশীর মত না হইলেও বেশ মানান-সই। রূপসীর রূপে তীব্রতা নাই—স্নিগ্ধতা আছে, চক্ষে লালসাপূর্ণ কটাক্ষ নাই—সলজ্জ চাহনী আছে। রমণীর একহস্তে একটী বর্ত্তিকা ও অপরহস্তে কিছু খাদ্যসামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি রমণীকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রমণী বলিলেন; "সন্ন্যাসি! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি উহাদের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী কিছুই স্পর্শ করেন নাই। এরূপভাবে দুইদিন কাটিয়া গেল! অনাহারে থাকিলে বাঁচি-বেন কিরূপে? অগ্রে এই খাদ্যসামগ্রী আহার করুন; আপনাকে বলিবার অনেক কথা আছে।"

"কি কথা মা? আপনি অগ্রে বলুন।"

"সে অনেক কথা। অগ্রে আহার করুন, মনে কিছুমাত্র দ্বিধা কর্ব্বেন না, সমস্তই আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করেছি। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমার হস্তে প্রস্তুত খাদ্যগ্রহণে দোষ হইবে না।"

কিশোরীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া অগত্যা রবীন্দ্রনাথ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। রবীন্দ্রনাথের আহার সমাপ্ত হইলে কিশোরী বলিলেন, "সন্ন্যাসি, আপনিই না আর একদিন এই জঙ্গলে দস্যুহস্তে বন্দী হ'য়েছিলেন?" রবীন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। কে এ রমণী? তাঁহাকেই বা এরমণী চিনিল কি প্রকারে? রবীন্দ্র আপন-মনে

এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রমণী পুনর্ব্বার বলিলেন, "সন্ন্যাসি, আমার বোধ হয় আপনি আমায় চিনিতে পারিলেন না ?"

"না মা, চিন্তে পারিনি।"

"সে-বারের কথা আপনার মনে পড়ে ?"

"পড়ে।"

"দুটী হতভাগিনী রমণীর কথা মনে পড়ে ?"

"পড়ে।"

"সেই দিন দস্যুগণ আপনারই সমক্ষে সেই দুটী অভাগিনী রমণীকে বলপূর্ব্বক কোথায় লইয়া যায়; আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও কি তাহাদের এ পর্য্যন্ত উদ্ধারের চেষ্টা ক'রেছেন ?"

"আমার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে আমি কিছুই করিতে পারি নাই। আপনি কে ? আপনি এ বিষয় কিরূপে জানিলেন ?"

"হাঃ—হাঃ! আমি কিরূপে জানিলাম ?" রমণীর অট্টহাস্যে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। রবীন্দ্রনাথ রমণীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। সে সরলতাময়ী প্রতিমূর্ত্তি আর নাই। কিশোরীর নয়নযুগল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে; গোলাপনিন্দিত গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে; অধরে হাসি ভীতিব্যঞ্জক। রমণী কি উন্মাদিনী ? রবীন্দ্রনাথ কয়েকপদ পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। আবার পরিবর্ত্তন!—সেই শান্ত, সরলা, মাধুর্য্যময়ী কিশোরী! এ কি মায়াবিনী! রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই কিশোরী আবার বলিলেন, "আপনি ভয় পেয়েছেন ? ভয় নাই, আমি উন্মাদিনী নই,—ক্রোধে, অভিমানে এবং প্রতিহিংসাবৃত্তির প্রবল তাড়নায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল।

মানুষের—বিশেষতঃ অবলা রমণীর হৃদয় অল্প-আঘাতেই ভেঙ্গে যায়—কিছু মনে কর্ব্বেন না সন্ন্যাসি।"

"মা, আপনার কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারলেম্ না; কেনই বা ক্রোধ, কি জন্যই বা অভিমান, আর আপনি কার উপরই বা প্রতি-হিংসা-পরায়ণা?"

"সন্ন্যাসি! যদি দিন পাই, যদি কখনও পাপিষ্ঠের উপযুক্ত দণ্ড দিতে সক্ষম হই, যদি শত্রুর উষ্ণশোণিতে করতল রঞ্জিত কর্ত্তে পারি, তখনই সব কথা আপনাকে বল্‌বো।"

"মা! আপনি কে, আর কি নিমিত্তই বা এই দুর্ব্বৃত্ত নরঘাতক দস্যুর সহবাসে কালযাপন কচ্ছেন, সে বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?"

"আমি আপনার পরিচিত না হলেও আর একদিন আপনি আমায় দেখেছেন।"

"কোথায় দেখেছি মা?"

"ঐ জঙ্গলে।"

"ঐ জঙ্গলে? দস্যুহস্তে বন্দিনীদশায়?"

"হাঁ—"

"আপনি সেই! আপনার সঙ্গিনী কোথায়?"

"এই খানেই আছে।"

"তিনি বোধ হয় আপনার আত্মীয়?"

হাঁ—আমার বিমাতা। তাঁর বিষয় আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না।"

"প্রয়োজন নাই। আর একটী বিষয় আমি জানতে চাই; যদি আপত্তি না থাকে—বল্‌বেন কি?"

"বিষয়টী না জান্‌লে কেমন ক'রে বল্‌বো—আপত্তি আছে কি না?"

"একটু পূর্ব্বে এই স্থানে বামাকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করেছি; বল্‌তে পারেন—এই সঙ্গীতকারিণী কে?"

"যদি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেন যে, এখানকার সম্বন্ধে যা' শুন্‌বেন বা যা দেখ্‌বেন, তা আপনি ব্যতীত আর তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না, তাহ'লে অনেক গোপনীয় বিষয়—যা' এখনও গোপন রেখেছি বা রাখবো বলে মনে কচ্ছি, সমস্তই আপনাকে বলবো। আর একটি কথা, ঐ সঙ্গে আপনার সাধ্যমত আমাকে সাহায্য কর্ব্বেন, —এ প্রতিজ্ঞাও কর্‌তে হবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের উভয়েরই অবস্থা তুল্য,—আর আপনিও মনে জান্‌বেন, আমার দ্বারা আপনার ইষ্ট বই অনিষ্ট হবে না।"

"মা, আমি একজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না; আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

রমণী কি ভাবিলেন; পরে বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আস্‌ছি।"

অনতিবিলম্বে রমণী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "সন্ন্যাসি! যতদূর দেখিলাম তাহাতে বুঝিতেছি, আজ আপনার জীবনের শেষদিন। দস্যুগণ এতদিন আপনাকে চিন্তে পারে নাই; কিন্তু আজ একজন আপনাকে চিনাইয়া দিয়াছে। কেন দিয়াছে,

তাহা জানি না। বোধ হয় আপনি বেঁচে থাক্‌লে তার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা।"

সহসা রমণীর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের অঙ্গুলীস্থ অঙ্গুরীটীর উপর পতিত হওয়ায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "আপনি এ অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলেন?"

"আপনি কি ইহা অন্য কাহারও নিকট দেখিয়াছিলেন?

রবীন্দ্র অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীটী খুলিয়া রমণীর হস্তে প্রদান করিলেন, রমণী তাহা নিবিষ্টচিত্তে কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, এইটীই বটে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—"চিনিতে পারিলেন কি?"

"এটী আমার মাতার অঙ্গুরী। মাতা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি ইহা সর্ব্বদাই পরিয়া থাকিতেন। মাতার মৃত্যুর পর পিতার হস্তে কয়েকদিন দেখিয়াছিলাম।"

"আপনার পিতা জীবিত আছেন?"

"জানি না; কেন না আমার বয়স যখন ৭ বৎসর তখন আমার মাতার মৃত্যু হয়; তার কিছুদিন পরে আমি মাতুলালয়ে আসি; তদবধি পিত্রালয়ে যাই নাই।"

"এতদিন আপনার পিতা আপনার সংবাদ নেন্‌নি কিম্বা আপনাকে দেখিতে আসেন নাই?"

"পূর্ব্বে আমার মামাকে পত্রাদি লিখে আমার সংবাদ নিতেন; কিন্তু কি জানি কেন, কখনও দেখিতে আসেন নাই। আজকাল পত্রাদিও বড় একটা লিখেন না।"

"অঙ্গুরীতে কি লেখা আছে? আপনি পারশী জানেন কি?"

অল্পস্বল্প জানি ; মামার কাছে শিখেছিলাম। এতে লেখা আছে—'মুসীবৎ ইয়া মেহেরবাণী'।"

সহসা বহির্দ্দেশে ঝনাৎ করিয়া একটা শব্দ হওয়ায় রমণী কক্ষদ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

[১০]

"আমি স্বচক্ষে দেখেছি সে পুরুষ।"

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সম্রাট্‌-নন্দিনীর কামরায় যিনি গিয়েছিলেন তিনি স্ত্রীলোক।"

আবদুল স্বহস্তে তার নিকট হ'তে পত্র নিয়ে গিয়েছিল। সে বল্‌লে পুরুষ। তার তখনই সন্দেহ হয়েছিল; আপনার হুকুমনামা দেখে কিছু বলতে পারেনি।"

"আমি স্ত্রীলোককেই হুকুমনামা দিয়েছি, আর স্বচক্ষে দেখেছি তিনি স্ত্রীলোক। বজরার একটী কামরায় দুইব্যক্তি এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন। প্রথম ব্যক্তি সেনানায়ক মহম্মদ মির্জ্জা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কুমার জগৎসিংহ। অনুপমা যখন পুরুষবেশে বজরায় প্রবেশ করেন তখন মহম্মদ মির্জ্জা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; তাই তিনি এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কেহই দেখিতে ভুল করেন নাই। এক্ষণে এরূপ তর্কের মীমাংসা কে করিবে? সেনানায়ক মহম্মদ মির্জ্জার মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিয়াছে। এরূপ সন্দেহের একটু কারণও আছে। কারণ—মহম্মদ সম্রাট্‌নন্দিনী মেহেরউন্নিসাকে ভালবাসেন। যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই সন্দেহ। এক্ষণে মহম্মদের একটু পূর্ব্ব-পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

মহম্মদ বাল্যকাল হইতেই সাহসী ও বীর। তাঁহার বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর, তখন একসময়ে সম্রাট্ নেপালের জঙ্গলে মৃগয়া করিতে যান। কিশোরবয়স্ক মহম্মদ, জনৈক হওলদারের অধীনে, তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মৃগয়া-উল্লাসে উল্লাসিত সম্রাট্ স্বীয় অনুচরবর্গ হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পড়েন। পরিশেষে যখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি অনুচরগণকে বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদের আগমনের প্রতীক্ষায়, অধিকন্তু স্বীয় ক্লান্তিদূরীকরণ-উদ্দেশে নিকটবর্ত্তী একটী নির্ঝরিণী-তটে উপবেশন করেন এবং ক্লান্তি-বশতঃ অচিরাৎ নিদ্রাভিভূত হন। যখন নিদ্রা অপনোদিত হইল তখন রজনীর প্রথম যাম উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাঁহার অনুচরবর্গের আগমনের কোন নিদর্শন নাই, কেবলমাত্র এই কিশোরবয়স্ক মহম্মদ মির্জ্জা তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট এবং তাঁহার পার্শ্বে একটী খণ্ড-বিখণ্ড অজগর-দেহ। সবিস্ময়ে সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহম্মদ! আর আর সকলে কোথায়?"

"জানিনা জাঁহাপনা, বোধ হয় অনেকদূর পেছিয়ে আছে।"

"তুমি কিরূপে আসিলে?"

"জাঁহাপনা, যখন আমি দেখিলাম যে জাঁহাপনার দেহরক্ষিগণ সকলেই পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে, তখন আমি আপনার অনুসরণ করিবার উদ্দেশে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলাম। যদিও আমার অশ্ব আপনার অশ্বের তুল্য বেগ-গামী নয়, তথাপি বেচারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। আপনি যখন এখানে উপস্থিত হইলেন, তার কিছুক্ষণ পরে আমিও আসিয়া পৌছিলাম; আসিয়া দেখিলাম—জাঁহাপনা নিদ্রিত।"

"এ সর্পকে তুমিই বিনাশ ক'রেছ ?"

"হাঁ জাঁহাপনা ! যখন আমি এখানে উপস্থিত হই, দেখিলাম ঐ ভীষণ সর্প আপনাকে দংশন উদ্দেশে আপনার বাহুমূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আমি ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলাম এবং অসি প্রহারে সর্পকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম।"

"তোমার ঘোড়া কোথায় ?"

"বেচারা সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে মারা পড়েছে।"

* * *

ঐ দিন হইতে মহম্মদ সম্রাটের সু-নজরে পড়িলেন। বীরত্ব, বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির গুণে মহম্মদ আজ দুই হাজারী সেনানায়ক। সম্রাট্ তাঁহার গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজের পুত্রের ন্যায় তাহার সকল আবদার সহ্য করিতেন। অন্দর-মহলেও মহম্মদের গতিবিধি ছিল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, যৌবনের দুর্দ্দম্য লালসার বশবর্ত্তী হইয়া মহম্মদ একজনকে ভালবাসিলেন। তিনিই সম্রাট-নন্দিনী কুমারী মেহের-উন্নিসা। কুমারী মেহেরউন্নিসার মনের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। তিনি তাঁহাকে শুধু আপনার কার্য্যোদ্ধারের আশায় সময়ে সময়ে নানাবিধ মিষ্ট সম্ভাষণে ভুলাইতেন ; কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে পিতার একজন সামান্য ভৃত্য বলিয়াই জানিতেন। অন্ধপ্রেমিক মহম্মদ ঘুণাক্ষরেও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অদ্যকার ব্যাপারে মহম্মদ মনে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এবিষয়ে কুমার জগৎসিংহকে একজন ষড়যন্ত্রকারী শত্রু বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে এবং বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।

মহারাজ মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহকে শাস্তি দেওয়াও নিতান্ত সহজ নয়। তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী সপ্রমাণ করিতে হইলে কুমারী মেহেরউন্নিসার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপণ করিতে হয় ও তাঁহার প্রণয়ের আশায় ছাই পড়ে। মহম্মদ উভয়সঙ্কটে পড়িলেন। ক্রোধে অভিমানে তাঁর ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল। তিনি সক্রোধে বলিলেন—"কুমার জগৎসিংহ, আপনি মহারাজ মানসিংহের পুত্র ব'লেই আজ আপনাকে ক্ষমা করলুম, আপনি ক্ষমার্হ ন'ন। মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রকারীর শাস্তি এই পদাঘাত।"

"সাবধান মহম্মদ, রসনা সংযত কর! ক্ষত্রিয়সন্তান জগৎসিংহ কাপুরুষ নয় যে, সে প্রাণের ভয়ে মিথ্যা কথা বল্‌বে।"

"জগৎসিংহ—"

"মহম্মদ—"

উভয়েই কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলেন। সহসা কক্ষদ্বারের পর্দ্দা সরিয়া গেল,—উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন—সম্মুখে সম্রাট্-নন্দিনী কুমারী মেহেরউন্নিসা। মেহেরউন্নিসা বলিলেন—"একি?"

জগৎসিংহ। বাদ্‌সাজাদি, গোলামের গোস্তাকী মাপ কর্ব্বেন, মহম্মদ অযথা আমার অপমান ক'রছে, তাই তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলাম।"

মেহের। মহম্মদ, তুমি এবিষয়ে কি বল্‌তে চাও?

মহম্মদ। সম্রাট্-নন্দিনি, দুষ্ট কাফের মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক।

জগৎসিংহ। সাবধান মহম্মদ—

মেহের। চুপ কর কুমার! তোমাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা পরে কর্ব্বো—যদি তোমরা আমায় বাঁচাতে চাও, উপস্থিত বিপদ হ'তে আমায় উদ্ধার কর্ত্তে চাও, তাহলে উভয়ে পূর্ব্বের মত সখ্যভাবে মিলিত হ'য়ে আমার সহায়তা কর।

জগৎসিংহ। আদেশ করুন—

মেহের। তুমি কি সম্মত নও মহম্মদ?

মহম্মদ। সম্মত, কিন্তু—

মেহের। কিন্তু কেন? খুলে বল।

মহম্মদ। কার্য্যের ভার একা আমার উপর দিন।

মেহের। না—তা হবে না, উভয়কে একযোগে কাজ কর্ত্তে হবে। আমার আদেশ।

মহম্মদ। আমি সম্রাটের গোলাম, সম্রাট্ ব্যতীত আর কা'রও আদেশ পালন কর্ত্তে বাধ্য নই।

মেহের। বাধ্য নও? কুমার! মহম্মদকে বন্দী কর!

মহম্মদ। সাবধান কাফের—

মেহেরউন্নিসা বুঝিলেন, উপস্থিতক্ষেত্রে কৌশল নিতান্ত আবশ্যক, বল-প্রকাশে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। চতুরা সম্রাট্-নন্দিনী কৌশলে জগৎসিংহকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিলেন এবং সহাস্যে মহম্মদকে বলিলেন, "মহম্মদ! তুমি বুদ্ধিমান হ'য়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে বৃথা আমার উপর ক্রোধ ক'চ্ছ, বৃথা অভিমান ক'চ্ছ। আমার বিপদে যদি তুমি সুখী হও, আমার মৃত্যুতে যদি তোমার আনন্দ হয়, বেশ, তা'হলে তুমি আমার সাহার্য্য কর্ত্তে অগ্রসর হয়ো না। বন্ধুহীন জীবন অপেক্ষা

মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়।—এতদিন আমার ধারণা ছিল, তুমি আমায় ভালবাস; এখন দেখ্‌ছি আমার সেটা ভ্রম। তুমি বীরত্বাভিমানী, ভালবাসা তোমার হৃদয়ে স্থান পায় না।" মেহেরউন্নিসা থামিলেন। মহম্মদ স্থির নিশ্চল কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। তিনি ভাবিতেছেন, যেন কোন অজানিত স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তবে কি সত্যই মেহেরউন্নিসা তাঁহাকে ভালবাসেন? তা' যদি হয় তাহাহইলে মহম্মদ আজ গুরুতর অপরাধী। মহম্মদ নিরুত্তর। মেহের-উন্নিসা আবার বলিলেন, "মহম্মদ"! সঙ্গে সঙ্গে প্রাণোন্মাদকারী কটাক্ষ! মহম্মদ আত্মহারা হইলেন। ক্রোধ অভিমান সব ভাসিয়া গেল—জড়িত-ভাষায় বলিলেন "বাদ্‌সাজাদি, আমায় ক্ষমা করুন।"

মেহেরউন্নিসা বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। মধুরবচনে কহিলেন "সুখী হ'লাম মহম্মদ! অগ্রে আমায় বিপন্মুক্ত কর, পরে আশাতীত পুরস্কার পাবে।" আবার কটাক্ষ! মহম্মদ যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য! বলিলেন—"অন্য পুরস্কারে প্রয়োজন নাই সম্রাট্‌-নন্দিনী, আগে কার্য্যোদ্ধার করি। তারপর আপনার—তোমার—"

মহম্মদের কথা বাধিয়া গেল। মেহের বুঝিলেন এবং আর একটী কটাক্ষবাণ হানিয়া মৃদুহাস্য করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল। মৌনং সম্মতিলক্ষণং বুঝিয়া মহম্মদ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় মেহেরউন্নিসা জগৎসিংহ ও মহম্মদ মির্জ্জাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কুড়িজন বাছা বাছা সৈনিক লইয়া প্রস্তুত থাকিও—ত্রিবেণীর জঙ্গলে যেতে হবে। আটটার সময় ঘোড়া আস্‌বে।

[১১]

"সয়তানি, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা"! বন্দী রবীন্দ্র নাথের কক্ষ হইতে সরমা বাহিরে আসিবামাত্র দস্যুসর্দ্দার বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিল, "সয়তানি, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা"!—তার পর একজন দস্যুকে আদেশ করিল-"ছকু, এই সয়তানী ঐ কাফেরটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র কর্‌ছিল, দুটোকে এখুনি গাছে লট্‌কে দে।"

সর্দ্দারের আদেশমত দুইজন দস্যু রবীন্দ্রনাথ ও সরমাকে লইয়া নিকটবর্ত্তী একটী তিন্তিড়ী বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। বৃক্ষতলে একটী কূপ এবং কূপের ঠিক উপরিভাগে বৃক্ষ শাখায় প্রলম্বিত একটী রজ্জু। কূপের উপরিভাগে একখানি তক্তা পাতা। যাহার ফাঁসি হইবে তাহাকে তক্তার উপর উঠাইয়া গলায় ফাঁসি পরাইয়া দেওয়া হইলে তক্তাখানি টানিয়া লইত। এইরূপে দুর্ব্বৃত্তগণ নিরীহ ব্যক্তিগণকে হত্যা করিত। প্রথমে তাহারা রবীন্দ্রনাথকে কূপের উপর উঠাইল। একজন দস্যু ফাঁসির রজ্জুটী পরীক্ষা করিল; তদ্দর্শনে সরমা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অবিলম্বে অনেকগুলি অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমশঃ খুব নিকট আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি মশালের আলোক ও একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সেইদিকে আসিতেছে দেখিয়া, দস্যুদ্বয় রবীন্দ্রনাথকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া, সর্দ্দারকে সংবাদ দিতে ছুটিল। দুর্ব্বলদেহ রবীন্দ্র সে আঘাতে ভূপতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইলেন।

দস্যুগণ প্রস্তুত হইতে না হইতে সশস্ত্র অশ্বারোহীদল আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল। এইরূপ অতর্কিত অবস্থায় সহসা আক্রান্ত

হইয়া অধিকাংশ দস্যু নিহত হইল এবং দুই জন পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল, সর্দ্দার বন্দী হইল। সহসা আর এক অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইল। একজন সুন্দরকান্তি অশ্বারোহী যুবক রবীন্দ্রনাথকে মুক্তকরণোদ্দেশে যেমন অশ্ব হইতে অবতরণ করিবেন, অমনি সেই অশ্বারোহী সৈনিকদলের মধ্য হইতে একজন মুসলমান সৈনিক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একটী বর্শা আসিয়া তাঁহার বামপদ ভেদ করিয়া অশ্বদেহে বিঁধিয়া গেল। "মহম্মদ! কি সর্ব্বনাশ কল্লে—মহম্মদ! কি সর্ব্বনাশ কল্লে" বলিতে বলিতে এক অশ্বারূঢ়া রমণী সেই আহত যুবকের নিকট দৌড়িয়া আসিলেন। "কাফের খুব বেঁচে গেছে—সাহাজাদি,—এত প্রবঞ্চনা! এরূপে মর্ম্মে আঘাত করা অপেক্ষা মৃত্যুদণ্ড ভাল ছিল—"। মহম্মদ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সম্রাট্-নন্দিনী মেহেরউন্নিসার মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা থামিয়া গেলেন। মেহের রোষকষায়িতলোচনে একবার মাত্র মহম্মদের দিকে চাহিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আহত যুবককে স্বীয় অঙ্কে শয়ন করাইয়া নিজের ওড়না দ্বারা ক্ষতমুখ উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন, এবং সরমা ও রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করিবার জন্য কতিপয় সৈনিককে আদেশ করিলেন।

যথাকালে উভয়ের সংজ্ঞাশূন্য দেহ সাহাজাদীর সম্মুখে নীত হইলে তাঁহার তৎকালীন সুব্যবস্থার গুণে সরমা ও রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাভ করিলেন। পরে মেহেরউন্নিসা মহম্মদকে ডাকিলেন; কিন্তু মহম্মদ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সাহাজাদী পুনরপি ডাকিলেন—কোন উত্তর নাই। তখন মেহেরউন্নিসা ক্রুদ্ধা হইলেন,—গম্ভীরভাবে জগৎসিংহকে বলিলেন, "কুমার! অবাধ্য

সৈনিককে বন্দী কর।" জগৎসিংহ ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া মেহের আরও ক্রুদ্ধা হইলেন এবং দৃঢ় অথচ আরও গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমার আদেশ,—এই মুহূর্ত্তে অবাধ্য মহম্মদ মির্জ্জাকে বন্দী কর। কাপুরুষগণ, মহম্মদ মির্জ্জাকে বন্দী করবার ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে কি এক জনেরও নেই?" মেহেরউন্নিসার দৃষ্টি ঘৃণাব্যঞ্জক অথচ অবিচলিত; কণ্ঠস্বর—অবিচলিত; মূর্ত্তি—ধীর স্থির। জগৎসিংহ আর ইতস্ততঃ করিতে পারিলেন না; মহম্মদকে বন্দী করিতে অগ্রসর হইলেন। মহম্মদ নিতান্ত পরুষস্বরে বলিলেন, "সাবধান কাফের! যদি আর একপদ অগ্রসর হবে, তাহলে আমার এই সুতীক্ষ্ণ তরবারি তৎক্ষণাৎ তোমার মস্তক স্কন্ধচ্যুত ক'রবে।" জগৎসিংহ পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন, উলঙ্গ অসিহস্তে মহম্মদকে আক্রমণ করিলেন। মেহের-উন্নিসা প্রমাদ গণিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, এরূপস্থলে এক-জনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নহে,—তিনি ক্ষিপ্রগতিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রুক্ষ অথচ বিষাদ বিজড়িত আবেগপূর্ণস্বরে মহম্মদ বলিলেন, "সম্রাট্‌নন্দিনি, আর বাধা দিবার প্রয়োজন নাই; এরূপ অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রতারিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—।" মহম্মদ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, পারিলেন না। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মেহেরউন্নিসা দেখিলেন, মহম্মদের নয়নকোণে দুইবিন্দু অশ্রু। মেহের কি চিন্তা করিলেন; তার পর দৃঢ় অথচ স্বাভাবিক কোমলস্বরে বলিলেন,—"মহম্মদ! স্থির জানিও, তোমার দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া একেবারে অসম্ভব ভবিষ্যতে হয় ত আশা করিতে পারিতে; কিন্তু

বর্ত্তমানক্ষেত্রে তোমার দোষে আশাদীপ নির্ব্বাপিত। তোমার কার্য্যে তোমার উপর আসক্তির পরিবর্ত্তে বিরক্তি জন্মিয়াছে। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া আজ যাহাকে হত্যা করিবার জন্য বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছ, সে পুরুষ নয়, রমণী। তোমার ন্যায় হঠকারী, তোমার ন্যায় বিবেচনাহীন ব্যক্তি কথনও বাদসাজাদী মেহেরউন্নিসার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না!"

সহসা মস্তকে ভীষণ অজগর দংশন করিলে অথবা বিনামেঘে অকস্মাৎ শতবজ্রাঘাত হইলে মানুষ কথনও এইরূপ ব্যথিত, সন্ত্রস্ত, চমকিত হইত না। মহম্মদ কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাষ্পাকুললোচনে যোড়হস্তে জানু পাতিয়া বলিলেন, "বাদসাজাদি, আমায় ক্ষমা করুন!" মেহেরউন্নিসা মহম্মদকে কিছু না বলিয়া আহত যুবককে বলিলেন, "অনুপমা এখন কেমন আছ?" রবীন্দ্র চৈতন্য লাভ সত্ত্বেও ঘটনার কিছুই এপর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে পারেন নাই,—কিন্তু এক্ষণে সম্রাটনন্দিনীর মুখে অনুপমার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "দিদি—দিদি—তুমি এখানে?"

"হাঁ দাদা, এই দেখুন আমি আজ সৌভাগ্যের ফলে আহত হয়েছি ব'লে সাক্ষাৎ করুণারূপিণী সাহাজাদীর শান্তিময় অঙ্কে শয়ন করেছি। এখন মৃত্যুও আমার পরম শান্তি—চরম সুখ। এঁর কৃপায় আপনাদিগকে যে দস্যুহস্ত হ'তে মুক্ত হ'তে দেখলাম, এই আমার পরম সৌভাগ্য—পরম শান্তি!"

"দিদি—তুমি নামে অনুপমা, গুণেও অনুপমা! সংসারে আবদ্ধ থেকেও তোমার এত নিঃস্বার্থপরতা, এরূপ পরহিতে আত্মত্যাগ!

যদি, সংসার ত্যাগী রবীন্দ্রকে আজ তুমি কর্ম্মযোগ-সাধনের প্রথম আদর্শ দেখালে!

"দাদা, আমি শুধু উপলক্ষ—সমস্তই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা!"

[১২]

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় পক্ষাধিক অতীত হইয়া গিয়াছে। স্রাট্‌নন্দিনী মেহেরউন্নিসা যথাকালে জগৎসিংহ প্রভৃতি সমভিব্যাবহারে রাজধানী আগরা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দস্যু-সর্দ্দার এখন সম্রাটের কারাগারে বন্দী। সম্রাট্‌নন্দিনীর যত্নে ও নিযুক্ত চিকিৎসকের সুব্যবস্থার গুণে অনুপমা আরোগ্যলাভ করিয়াছেন এবং সাহাজাদীর নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত তিনি তাঁহার পালিত শিশু, সরমা ও রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া ভারতের রাজধানী আগরা নগরী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত সকলের থাকিবার স্থান বাদসাহের অন্তঃপুরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র আছেন।

অদ্য দস্যু-সর্দ্দারের বিচারের দিন। মহারাজ মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ এবং সেনানায়ক মহম্মদের কৌশল ও বীর্য্যপ্রভাবে বাঙ্গালার নিরীহ প্রজার বিষম শত্রু করতলগত হইয়াছে বলিয়া সাহানসা সম্রাট্ আকবর সাহ স্বহস্তে ঐ দুই বীর যুবককে পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিবেন, সেই জন্য আজ এই দরবারের আয়োজন। দরবার-গৃহ লোকে লোকারণ্য,—নানাবিধ আলোকমালায় শোভিত হইয়া আগন্তুকের মনে রজনীতে দিবাভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে। ভিত্তিগাত্রে, স্তম্ভে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকারের নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর চিত্র ও দেওয়ালগিরি।

বহুরত্নখচিত সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইটী সুবৃহৎ ঝাড়। মেজেটী বহু-মূল্য কার্পেটে মোড়া। সিংহাসনের দক্ষিণ ও বাম উভয় পার্শ্বে সারি সারি অনেকগুলি মূল্যবান মখমল-মোড়া কাষ্ঠাসন। উপরে মণিমুক্তার ঝালর সম্বলিত সুবিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ। উচ্চ ও নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিশিষ্ট ও সাধারণ প্রজামণ্ডলীতে দরবার-গৃহের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্ব সুন্দর সুচিত্রিত পর্দ্দাদ্বারা আচ্ছাদিত; সেই স্থান অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

যথাসময়ে সম্রাট্ আকবরসাহ আসিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সমবেত জনসঙ্ঘের সকলেরই মনে দারুণ উৎকণ্ঠা। সৈনিক বিভাগের ছোট বড় প্রত্যেকেরই মনে বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। এরূপ ঔৎসুক্য দস্যু-সর্দ্দারের দণ্ডাজ্ঞা শুনিবার জন্য নহে, কেবল মাত্র কুমার জগৎসিংহ ও মহম্মদকে সাহানসা বাদসাহ কিরূপ পুরস্কারে সম্মানিত করেন তাহাই জানিবার জন্য সকলে ব্যগ্র। যিনি পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক, তিনি ভাবিতেছেন যদি মহম্মদের পরিবর্ত্তে তিনিই কুমার জগৎসিংহের সহকারীরূপে যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ সম্রাটের অনুগ্রহে তাঁহারও নিশ্চয়ই পদবৃদ্ধি হইত। ছোট বড় সকলেই এরূপ কত কল্পনা করিয়া মনে মনে আক্ষেপ করিতেছেন। মহম্মদের হৃদয় আজ আনন্দে উৎফুল্ল। আপন মনে কত ভাঙ্গিতেছেন—কত গড়িতেছেন। এক একবার ভাবিতেছেন, আজ তিনি মহানুভব সম্রাট্ আকবর সাহের নিকট তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন পুরস্কারস্বরূপ ভিক্ষা করিবেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় একজন সামান্য সেনানায়কের যে এরূপ আশা বাতুলতা

মাত্র, এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তাঁহার প্রফুল্ল বদনমণ্ডল বিষণ্নতার তিমিরাবরণে আবৃত হইতেছে। কখনও সাহাজাদী মেহের উন্নিসাকে তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ভাবিয়া কতকটা শান্ত হইতেছেন। এই সময়ে ভারতসম্রাট্ মহারাজ মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ মানসিংহ, কুমার জগৎসিংহ আপনার যোগ্য পুত্র। পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে কুমার যেরূপ রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, এবং দুরন্ত দস্যুদমন করিয়া বঙ্গবাসী প্রজাগণকে যেরূপ বিপন্মুক্ত করিয়াছেন, ইহা কেবল আপনার নয়, আমারও অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।" তৎপরে মহম্মদ মীর্জ্জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহম্মদ! প্রথম হইতেই তোমার সাহস ও প্রভুভক্তি প্রশংসনীয়; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তোমার কার্য্যে বড়ই প্রীত হইয়াছি।"

পরে বন্দী দস্যুদলপতি বিচারার্থ দরবারে আনীত হইল। মহারাজ মানসিংহ দস্যুসর্দ্দারকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দস্যুসর্দ্দার ধীর অথচ সদর্পে উত্তর করিল, "দস্যু দণ্ডের জন্য সম্রাট্ দরবারে আনীত হইয়াছে, তাহার পরিচয় জানিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই।" তাহার এবম্প্রকার সগর্ব্ব উত্তরে দরবারের সকলেই সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এমন কি গম্ভীরমূর্ত্তি সাহানসা সম্রাট্ আকবরসাহের বদনমণ্ডলে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। মহারাজ মানসিংহ পুনরপি বলিলেন, "যখন বিচারার্থ তুমি এখানে আনীত হইয়াছ, তখন তোমার সমস্ত বিষয়ই জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন এবং সকল প্রশ্নেরই তোমার যথাযথ উত্তর দিতে হইবে।" দস্যুসর্দ্দার পূর্ব্ববৎ সগর্ব্বে উত্তর করিল, "উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার নিজের হাত; বিশেষতঃ মোগলের অন্নদাস

কাফেরকে আমি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।" দস্যুসর্দ্দারের এরূপ অপমানসূচক বাক্যে মহারাজ মানসিংহের বদনমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। সম্রাট্ স্বয়ং বাধা প্রদান না করিলে তাঁহার কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ তরবারি তৎক্ষণাৎ দস্যু-সর্দ্দারের শির স্কন্ধচ্যুত করিত। কিন্তু সম্রাট্ বাধা দিয়া কহিলেন "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন! মারিয়া ফেলিলে সব শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত ওর বিষয়ে অনেক কথা আমরা জানিতে পারিব এবং হয়ত তাহা আমাদের উপকারে আসিবে। আমার বোধ হয় এ ব্যক্তি পাঠানদের অন্যতম নেতা।" অতঃপর সম্রাট্ স্বয়ং দস্যুসর্দ্দারকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে দস্যুসর্দ্দার বলিল, "আমি আপনাদের চিরশত্রু পাঠান, ইহা ব্যতীত আমার অন্য পরিচয় নাই; আর কোন বিষয় আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না, করিলেও উত্তর পাইবেন না।" সম্রাট্ দেখিলেন ইহাকে প্রশ্ন করা বৃথা, সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পরে কুমার জগৎসিংহ ও মহম্মদ এবং অন্যান্য সৈনিকগণকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া দরবার ভঙ্গ করিলেন। পরদিন দস্যুপতির পুনর্ব্বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

[১৩]

পরদিন বাদসাহের অন্তঃপুরস্থ একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া সাহাজাদী মেহেরউন্নিসা অনুপমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আবশ্যকবোধে তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম।

মেহের। বন্দী দস্যুর মুক্তির জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন ?

অনুপমা। নীচ দস্যু হইলেও উহার সাহস প্রশংসনীয়।

মেহের। আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর তুমি কি উত্তর দিলে ?

অনুপমা। আমি ত কিছুই অন্যায় বলিনি সাহাজাদী। এরূপ সাহসী ও বীর সংসারে বড় উপকারে আসে।

মেহেরউন্নিসা অনুপমার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—করুণাময়ী অনুপমার নয়নোৎপলযুগল আগ্রহপূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহারই বদনমণ্ডলে স্থাপিত। সাহাজাদী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন, বলিলেন—' বেশ, তাই হবে ; আমি দস্যুর মুক্তির চেষ্টা ক'র্ব্বো,—কিন্তু একটা কথা, মুক্তি পেলে যদি সে আবার দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে ?"

অনুপমা বলিলেন, "সে উপায় রাখবো না—ওর জীবনের বিনিময়ে আমি ওর স্বাধীনতা ক্রয় কর্ব্বো।"

"কেনা গোলাম ক'রে রাখবে নাকি ?" এই কথা বলিয়া সাহাজাদী ঈষৎহাস্য করিলেন। পরে ইঙ্গিতে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সাহাজাদী কক্ষান্তরে গমন করিলেন। এমন সময়ে একটী শিশুকে কোলে লইয়া সরমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিলেন "এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?" লজ্জাবনতমুখী সরমা একটু জড়িতস্বরে উত্তর করিলেন, "বাগানে একটু বেড়াইতে ছিলাম।" অনুপমা আর কিছুই বলিলেন না ; কিন্তু সরমার এরূপ সঙ্কুচিত হইবার কারণও কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তাহাতে যেন সরমার ব্রীড়াসঙ্কুচিত ভাব কথঞ্চিৎ

বিদূরিত হইল। সরমা বলিলেন,—"এখানে আর ক'দিন আমাদের থাকা হবে ?"

অনুপমা বলিলেন—"কেন সরমা ?"

"তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

"তোমার কি আগরা সহর ভাল লাগছে না ?"

"মোটেই নয়"।

"আচ্ছা, তবে আজ সাহাজাদীকে ব'লে যাতে শীঘ্র আমাদের ত্রিবেণী যাওয়া হয় তার ব্যবস্থা কর্ব্বো। আচ্ছা এমন সহর তোমার ভাল লাগছেনা কেন ?"

"আপনার কি ভাল লাগছে ? আমার যেন বোধ হয়, এর চেয়ে আমাদের ত্রিবেণী ভাল। এখানে যেন সকলেই পরাধীন। বাদসার অন্দরমহল ব'লে এখানে বাতাসেরও যেন আসতে নিষেধ। বনের পাখী—কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, তারাও যেন স্বাধীনতা হারিয়ে ম্রিয়মাণ। তা' ছাড়া এখানে—না—এখানে আর আমার থাকতে ইচ্ছা হচ্ছেনা।" সহসা সরমার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। অনুপমা যে তাহা লক্ষ্য করিলেন না তাহা নহে। তাঁহার ললাটদেশে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিল। এমন সময়ে হাস্যমুখে সম্রাট্‌নন্দিনী মেহেরউন্নিসা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "অনুপমা, পিতা আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। তোমার কথামত তাঁকে বলায়, তিনি বলেছিলেন, বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব ;—এইমাত্র তাঁর অভিমত জান্‌তে গেছলাম ; দেখলাম তিনি সম্মত। এখন চল, আমরা প্রস্তুত হইগে,—দরবারের সময় উপস্থিত হ'তে হবে।"

তখন তাঁহারা সে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন। যথাসময়ে দরবারগৃহে দস্যুসর্দ্দার আনীত হইলে সম্রাট্ বলিলেন, "তুমি কিরূপ দণ্ড কামনা কর?"

দস্যুসর্দ্দার তদুত্তরে বলিল, "সম্রাটের যা অভিরুচি।"

সম্রাট্ বলিলেন "শোন, যাঁর চেষ্টায় তোমাদের দল ধৃত হইয়াছে, তিনিই তোমার মুক্তির জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। তুমি মুক্তি পাইবে বটে, কিন্তু তোমাকে তোমার মুক্তিদায়িনীর গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে। কেমন প্রস্তুত আছ?"

দস্যুসর্দ্দার বলিল, "আমার মুক্তিদায়িনী কে?"

"তোমাদের হস্তে নিহত হেমেন্দ্রনাথ রায়ের ভগ্নী—অনুপমা।"

দস্যুসর্দ্দার স্তম্ভিত হইল। দরবারস্থ সকলে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বাদসাহের মুখের দিকে চাহিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; এইকথা শুনিয়া তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—স্থান, কাল, অবস্থা, যেন সমস্তই বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অনুপমা, সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া আমার যে শিক্ষালাভ হয় নাই, তুমি গৃহে থাকিয়াও তদপেক্ষা অধিক শিক্ষালাভ ক'রেছ।"

দস্যুসর্দ্দার বলিল, "সম্রাটের আদেশমত আমি আমার মুক্তিদায়িনীর গোলামী করিতে প্রস্তুত আছি।"

সম্রাট্ বলিলেন, "দেখ', যেন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রো না।"

দস্যুসর্দ্দার বলিল, "পাঠান জান চেয়ে জবান ঠিক রাখে।" অন্যান্য কার্য্যের পর দরবার ভঙ্গ হইল।

[১৪]

পরদিন অনুপমা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে ত্রিবেণী যাত্রা করিলেন। সম্রাট্‌নন্দিনী মেহেরউন্নিসা প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ অনুপমাকে একটী মণি-মুক্তাখচিত সুন্দর কৌটা এবং সরমাকে কয়েকটী সুন্দর মূল্যবান অলঙ্কার এবং শিশুকে কয়েকটা সুন্দর খেলনা প্রদান করিলেন। শিশু খেলনা পাইয়া পরম পুলকিত হইল। পাছে পথিমধ্যে কোন বিপদ আপদ ঘটে, সেই জন্য সাহাজাদী কতিপয় সৈন্যসহ কুমার জগৎসিংহকে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন।

যথাকালে তাঁহারা সকলে ত্রিবেণী উপস্থিত হইলেন। পথে উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। এই কয়দিন স্থানান্তরে থাকাতে যেন চিরানন্দময়ী জন্মভূমি তাঁহাদের চক্ষে কেমন একটা নবভাব জাগরূক করিয়া দিতেছে। অনুপমা সেই দিবস কুমার জগৎসিংহকে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কুমার সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বহুদিন পরে স্নেহময়ী জননীকে সন্দর্শন করিয়া সন্তান যেমন পুলকিত হয়, ভীমচাঁদ আজ সেইরূপ আনন্দিত। সে আজ একাই দশের কার্য্য করিতেছে। হাঁকডাক দৌড়াদৌড়ি হাট-বাজার করা প্রভৃতি সকল কাজেই ভীমচাঁদ আজ অগ্রণী। ভীমচাঁদ কুমার জগৎ-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। কুমার তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর যেমন সে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, অমনি তাহার দৃষ্টি আর একজনের উপর পড়িল। ভীমচাঁদ চমকিয়া উঠিল। জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীমচাঁদ! অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে?" অন্যমনস্কভাবে ভীমচাঁদ

উত্তর করিল "আজ্ঞে কিছু না,—হ্যাঁ,—যাচ্ছি,—তাইতো সেই পিশাচ!" জগৎসিংহ সহাস্যে বলিলেন, "ভীমচাঁদ, বিস্মিত হোয়োনা,—পিশাচও মানুষের বশ হয়। তোমার মা যে পিশাচসিদ্ধ, ঐ পিশাচ এখন তাঁরই গোলাম।" ভীমচাঁদ কোন কথা কহিল না—ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ভীমচাঁদ সেখান হইতে বরাবর পাকগৃহে গমন করিয়া অনুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "মা সেই ডাকাতের সর্দ্দার কোত্থেকে এল?"

"বাবা! আমিই ওকে এনেছি। বিশেষ অনুরোধ করায় বাদসা দয়া ক'রে ওকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন ও আমার দাসত্ব স্বীকার ক'রেছে।"

"মা আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, ও মুসলমান, নিশ্চয়ই নিমকহারামী কর্ব্বে।"

"না ভীমচাঁদ, ও তা পার্ব্বে না।"

"আহা মা! তোমার এত দয়া! মানুষের যে এত দয়া আছে তা, আমার ধারণা ছিল না। আচ্ছা মা, আমি এখন আসি, অনেক কাজ হাতে আছে।" ভীমচাঁদ প্রস্থান করিলে অনুপমা স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

অতিশয় আনন্দের সহিত সে দিবস অতিবাহিত হইল। পরদিন কুমার জগৎসিংহ আগরাযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধীনস্থ সৈন্য-গণকে অগ্রগামী হইতে আদেশ করিয়া তিনি অনুপমা ও রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাত করতঃ বিদায় গ্রহণ করিলেন। দ্বারে অশ্ব সজ্জিত ছিল;

যেমন অশ্বে আরোহণ করিতে অগ্রসর হইলেন হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি একটী উন্মুক্ত গবাক্ষের দিকে পতিত হওয়ায় দেখিলেন একখানি ঢলঢলে চাঁদ-পানা মুখ—তাঁরই দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে! সে মুখ দেখিয়া জগৎ-সিংহের মনে কি যেন কি হইয়া গেল। কেন এমন হইল? এমুখ ত তাঁহার নিকট অপরিচিত নয়? এ মুখ অনেকবার দেখিয়াছেন। আজ তবে এমুখ দেখিয়া তাঁহার মনে এরূপ নবভাবের উন্মেষ হইল কেন? জগৎ-সিংহ দেখিলেন মুখখানি সুন্দর। সুন্দর বস্তু কে না দেখিতে চায়? তিনি অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। যতই দেখেন ততই সুন্দর! জগৎসিংহ ধীরে ধীরে গবাক্ষ-সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কিশোরীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল,—পারিল না। এ কি? সরমা, একজন অপরিচিত বিদেশী যুবককে দেখিয়া তোমার এরূপ ভাবান্তর হইল কেন? জগৎসিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন "এরূপ সঙ্কুচিতা হচ্ছেন কেন?" সরমার মুখখানি আরও লাল হইয়া উঠিল। আবার বলিলেন, "বাদসার উদ্যানে আপনার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ, তখন ত আপনার এরূপ ভাব দেখি নাই? আজ যাবার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; সেই জন্যই কি মনে মনে আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া এরূপ ভাব দেখাইতেছেন?" তখন বোধ হয় সরমার মনে হইতেছিল—"রুষ্ট হইব্ না কেন? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, যাবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও ইচ্ছা হইল না? কিন্তু সরমা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। তাহার দেহলতা বায়ুসঞ্চালিত বেতসের ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। সরমা! আজ তোমার একি ভাব? তুমি

কি মনে মনে এই বিদেশী যুবককে আত্মসমর্পণ করিয়াছ? যুবকের সুন্দর রমণীমোহন রূপ দেখিয়া কি মজিয়াছ? যদি তাই হয়, তাহা হইলে তুমি বড় অপরিণামদর্শিতার কার্য্য করিয়াছ। এখনও উপায় আছে; চেষ্টা করিলে নিজের মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পার। তোমার মুখ চোখও তোমার মনের কথা বলিয়া দিতেছে,—তুমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ,—বোধ হয় আর ফিরিতে পারিবে না।

জগৎসিংহ তরুণীর সেই ব্রীড়াসঙ্কুচিত ক্ষীণ দেহলতা, নিবিড়-জলদ-জাল-নিভ অংসগণ্ড-কপোল-বিক্ষিপ্ত-আলুলায়িত চূর্ণকুন্তল, লাজলোহিত-গণ্ডস্থল অনিমেষ নয়নে দেখিতেছেন। দেখিয়া আশা মিটিতেছে না। জগৎসিংহের অপরাধ কি? মানুষের আশা কখনই মিটেনা। সহসা তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। গৃহাভ্যন্তর হইতে কে ডাকিল,—"সরমা!"—সরমার চমক ভাঙ্গিল। করুণদৃষ্টিতে আর একটীবার জগৎসিংহের পানে চাহিয়া সরমা প্রস্থান করিল! তার সে ই নীরব করুণদৃষ্টি যেন জগৎ-সিংহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া গেল। তখন জগৎসিংহ ক্ষুণ্নমনে অশ্বারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয়দর্পণে একটী সুন্দরী কিশোরীমূর্ত্তি প্রতিফলিত রহিয়া গেল।

[১৫]

আগরা প্রত্যাগমন করিয়া অবধি মহম্মদ মির্জ্জা, একদিনও সাহাজাদী মেহেরউন্নিসার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আপন মনে কত ভাঙ্গিতেছেন, কত গড়িতেছেন; কিন্তু সম্রাটনন্দিনী যে তাঁহার প্রণয়ের পক্ষপাতিনী নহেন, এ বিশ্বাস মনোমধ্যে স্থান দিতে

পারিতেছেন না। আশায়, উদ্বেগে পক্ষাধিক কাল অতীত হইয়াছে। অদ্য যেরূপেই হউক, তিনি সম্রাট-নন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃত-সংকল্প। তাঁহার গৃহের অনতিদূরে ফুলজানীনাম্নী মেহেরউন্নিসার এক বৃদ্ধা ধাত্রী বাস করিত। মহম্মদ ফুলজানীর গৃহাভিমুখে চলিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৃদ্ধা ফুলজানী নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া কতিপয় বিড়ালকে দুধ-ভাত খাওয়াইতেছে, আর আপন মনে বকিতেছে। কখন বা মিশিকৃষ্ণ দন্তচতুষ্টয় বিকাশ করিয়া হাস্য করিতেছে। অদূরে একটী তরুণী দাঁড়াইয়া বৃদ্ধার কার্য্যকলাপ দেখিয়া হাসিতেছে। বৃদ্ধা এতক্ষণ তরুণীকে লক্ষ্য করে নাই ; সহসা তাহাকে হাসিতে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "হাসছিস্ কেন লা ?"

"তোমার রঙ্গ দেখে !"

"কি দেখ্লি পোড়ামুখী ?"

"লোকে সকলকেই নিজের মত দেখে।"

বৃদ্ধা তরুণীর বিদ্রূপ-উক্তিতে বড়ই রুষ্ট হইল। চঞ্চলস্বভাবা তরুণী বৃদ্ধা মাতামহীকে এরূপ মধ্যে মধ্যে রাগাইত। আজিও বৃদ্ধা রুষ্ট হইল দেখিয়া সে হাসিতে লাগিল। এমন সময় মহম্মদ ফুলজানীর গৃহে প্রবেশ করিল। সহসা একজন সৈনিক পুরুষকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল, তরুণী কক্ষমধ্যে লুকাইল। বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া মহম্মদ বলিলেন, "ফুলজানী, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি বিশেষ কার্য্যবশতঃই তোমার নিকট আসিয়াছি। বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, তোমায় সাহায্য করিতে হইবে।"

বৃদ্ধা বড়ই বিস্মিত হইল। সসম্ভ্রমে কহিল—"আপনি বাদশার

সেনানায়ক, আমি একজন দরিদ্র বাঁদী; আপনার বিপদে কি সাহায্য করিতে পারি?"

"সেনানায়ক হইলেই কি তাহার বিপদ হইতে পারে না? আমি যে বিপদে আজ বিপন্ন, আমি বেশ জানি, একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কেহ এ বিপদে সাহায্য করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধা আরও বিস্মিত হইয়া কহিল—"মহাশয়! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! যাহাহউক, সমস্ত ব্যাপার যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আপনার কথার উত্তর দিতে পারি।"

"সে অনেক গোপনীয় কথা। এখানে সে কথা বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

"তবে আসুন"—বলিয়া বৃদ্ধা মহম্মদকে একটী নিভৃত কক্ষে লইয়া গেল। সেখানে তাহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইলে পর, মহম্মদ প্রফুল্লমনে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ফুলজানী হাসিতে হাসিতে একটী আসরফীর তোড়া হস্তে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিল। কিশোরী দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ও আসরফী কিসের?"

"আজকের রোজগার।"

"তোমার ঐ রূপ দেখে মিঞাসহেব মজে গেলেন নাকি?"

"তা নয় ত কি? তোদের মতন শিমূলফুলের রূপ থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? তোরা ভরা জোয়ারে একটা পিঁপড়ে আটকাতে পারিস্ নি, আর আমার এ ভাটার টানে অতবড় হোমরা-চোমরা, বাদশার সেনাপতি এক কথায় পাঁচশো আসরফী দিয়ে গেল। এ তো বায়না!"

"বলি, ব্যাপারটা কি খুলেই বল না ?"

"ব্যাপার আর কি—ঘটকালি।"

"বলি, কার ঘটকালি, খোলসা ক'রেই বল ?"

"ন্যাকা ছুঁড়ি, গরজ দেখে বুঝছিস্ না কার!"

"মঞ্জাসাহেবের যে গরজ তা ত বুঝিছি—কিন্তু প্রণয়িনীটী কে ?"

"বড় একটা কেউ-কেটা নয়। বাদশাজাদী মেহেরউন্নিসা।"

"ও বাবা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! গর্দ্দানা যাবে যে ?"

"ভয়ের কারণ বটে; কিন্তু আমার বোধ হয় কার্য্য উদ্ধার হলেও হতে পারে।"

"যে কাজে নিশ্চয়তা নেই, সে কাজে হাত দেওয়া, আর জল্লাদের তলোয়ারের মুখে গর্দ্দান বাড়িয়ে দেওয়া দুইই সমান। আমার কথা শোন, যদি ভাল চাও তো আসরফী ফিরিয়ে দাও। আমরা গরিবমানুষ আমাদের গরিবানা চালই বেশ। ওসব কাজে হাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। জানে বেঁচে থাকলে ভিক্ষে ক'রে খেলেও দিন যাবে।"

বৃদ্ধা মতিয়ার কথা শুনিয়া মনে মনে কি চিন্তা করিল। ভাবিল আসরফী ফিরাইয়া দি, কিন্তু একসঙ্গে পাঁচশত আসরফী হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিবে? কার্য্য বিশেষ কঠিন নয়। একবার মাত্র বাদসাজাদী মেহেরউন্নিসার সহিত মহম্মদের সাক্ষাৎ করান, পুরস্কার হাজার আসরফী. পাঁচশত আসরফী বায়না, সাক্ষাৎ করাইলে আরও পাঁচশত পাওয়া যাইবে।- তাহার ন্যায় একজন সামান্য স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। যাহাহউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ফুলজানী ঠিক করিল, হস্তগত ধন ত্যাগ করা হইবে না। বৃদ্ধ

মতিয়ার কথা শুনিল না, সত্বর প্রয়োজনমত সাময়িক বেশভূষা পরিধান করিয়া বাদশার অন্দরমহলের পথে চলিল। মতিয়া মাতামহের আসন্ন-বিপদের কথা ভাবিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।

[১৬]

আটটা বাজিয়াছে। বাদসাহের অন্তঃপুরের এক সুসজ্জিত কক্ষে মনোহর পালঙ্কে বসিয়া একটী সুন্দরী যুবতী সারঙ্গ বাজাইয়া গান করিতেছিল। মন্দপবন উন্মুক্ত গবাক্ষপথে চোরের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া যুবতীর চারুকুন্তল দোলাইয়া তাহার সুবাস হরণ করিতেছিল। আতর গোলাপ কস্তুরীবাসে কক্ষটী আমোদিত। ফুলদানীতে গোলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন উৎকৃষ্ট পুষ্পের স্তবকসমূহ পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত। একি, ফুলের রাণী গোলাপের এত অনাদর কেন? সজ্জাকর সর্ব্বশেষে ফুলের রাণী গোলাপের স্থান নির্দ্দেশ করিল কেন? বোধ হয় নিকটে থাকিলে যুবতীর সুন্দর কপোলযুগের গোলাপী আভার নিকটে গোলাপের আভা ম্লান দেখায়, সেই নিমিত্ত বুদ্ধিমান সজ্জাকর তাহাকে দূরে সংস্থাপন করিয়াছে। যুবতী—মেহেরউন্নিসা। মেহেরুন্নিসা গাহিতেছিলেন,—

ধ্যান না লাগাও মেরা তু এ্যায়সা পাষাণ
তেরা ইশক্‌কে লিয়ে মেরী জান।
রোতে রোতে হুয়ে জনম গুজর গেই।

* " *

গান সমাপ্ত হইল না। সাগরোদ্দেশে প্রধাবিত স্রোতস্বতীর গতি অর্দ্ধপথে রুদ্ধ হইল। বৃদ্ধা ধাত্রী ফলজানা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ

করিল। মেহেরউন্নিসা গান বন্ধ করিয়া ফুলজানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো! আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে?" ফুলজানী বলিল "কেমন আছ তাই দেখ্‌তে এলাম।"

মেহের।—আমার কথা বল্‌ছিস্?

ফুলজানী। - তা নয় ত আবার কা'র?

মেহের। – আমাদের মরা বাঁচা দুই সমান।

ফুলজানি।—আজ যে নতুন কথা শুনচি?

মেহের।—তুইই আজকাল নতুন হয়েছিস্; মরেছি কি বেঁচে আছি —একবার খপরও নিস্‌না।

ফুলজানি।—আমরা গরিব দুঃখী লোক, দুঃখের ধান্দা কোরে বেড়াতে হয়। দিন-দুনিয়ার মালিক বাদসাজাদীর আবার দুঃখ কিসের?

মেহের।—তোর মনে ধারণা বুঝি আমাদের দুঃখ থাকতে নেই? ফুলজানি, সুখ দুঃখ সকলেরই আছে। সুখ দুঃখ নিয়েই যখন দুনিয়া, তখন আর আমীর গরিব কি?

ফুলজানি।—তোমাদের সুখ দুঃখ নিজের হাতে, মনে ক'ল্লেই আপনার দুঃখ আপনি দূর কর্ত্তে পার।

মেহের।—তা হয়না ফুলজানি! যাক্, এখন তুই কি মনে কোরে এসেছিস্ তাই বল।

ফুল।—আমি এসেছি—আমি এসেছি—

মেহের।—অমন আম্‌তা আম্‌তা করিস্ কেন? খোলসা ক'রে বল, তুই নিজের ইচ্ছায় এসেছিস্—না কেউ তোকে পাঠিয়েছে?

ফুল।—আমায় পাঠিয়েছে—

মেহের।—কে পাঠিয়েছে ?

ফুল।—মহম্মদ।

মেহের।—বুঝেছি, আমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছিস ব'লে তোকে মাপ করছি। আর কখনও আমার সাম্‌নে আসিস্‌নে।

ফুল।—সাহেবকে কি বোল্‌বো ?

মেহের।—বলিস্‌ তার মত একজন সামান্য নফরের মুখে বাদসাজাদী মেহেরউন্নিসা দু'শো পয়জার মারে। যা—

ফুল।—তিনি সাক্ষাৎ কর্ত্তে চান।

মেহের।—ফুলজানি, যদি জান বাঁচাতে চাস্‌ এখান থেকে বেরো !

ফুল।—তিনি এসেছেন।

মেহের।—সাহানসা বাদসা আকবর সার হারেমে ? কার হুকুমে ? আমার বিশ্বাস, তুই তাকে এনেছিস্‌ ! যদি ভাল চাস্‌ ত এখনই যা ফুলজানি।

ফুল।—বাদসাজাদি, আমার অপরাধ হ'য়েছে, আমায় ক্ষমা কর। আমি যেতে পার্ব্বোনা ; গেলে তাঁর হাতে প্রাণ যাবে। ম'র্ত্তে হয়, তোমার হাতে মোর্ব্বো।

মেহের।—আমি থাক্‌তে মহম্মদের এতটা সাধ্য নেই যে তোর অনিষ্ট কর্ত্তে পারে। যা—তুই নিশ্চিন্তমনে বাড়ী যা !

ফুল।—সে আমায় আসরফি দিয়েছে, বুকের রক্তে তার শোধ নেবে।

মেহের।—কিছু হবেনা, তার আসরফি ফিরিয়ে দিইগে।

বৃদ্ধা ফুলজানী চলিয়া গেল। নানাচিন্তায় সম্রাটনন্দিনী মেহের উন্নিসার আর সে রাত্রিতে ভালরূপ নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলেন, বাঙ্গালায় পাঠানেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সম্রাট্ আকবর সাহ পাঠানদিগের বিদ্রোহ-দমনার্থ উপযুক্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে কুমার জগৎসিংহকে পাঠাইয়াছেন। লোকপরম্পরায় আরও শুনিলেন যে মহম্মদ নিরুদ্দিষ্ট। মেহেরউন্নিসা কুমার জগৎসিংহের জন্য চিন্তিতা হইলেন। মেহেরউন্নিসা কি তবে কুমার জগৎসিংহকে ভালবাসেন?

[১৭]

সাহাজাদী মেহেরউন্নিসার প্রণয়লাভে নিরাশ হইয়া মহম্মদের হৃদয়ে হিংসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, কুমার জগৎসিংহই তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ বিদ্বেষের ভাব জাগিয়া উঠিল। কেমন করিয়া কুমার জগৎসিংহকে তার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন, মনে মনে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই সংবাদ পাইলেন, বাঙ্গালায় পাঠানেরা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের নির্ম্মম অত্যাচারে বঙ্গবাসী প্রজাগণ ব্যথিত প্রপীড়িত বিদ্ধস্ত হইতেছে! পাঠানেরা কাহারও ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ করিয়া দিতেছে, কাহারও বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতেছে, কোথাও বা ব্যভিচারের স্রোতে অবলা বঙ্গসতীর সতীত্বধর্ম্ম কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! সম্রাট্ আকবরসাহ এই সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে উপযুক্ত সেনা সমভিব্যাহারে কুমার জগৎ-সিংহকে দুরন্ত পাঠানের বিদ্রোহ-দমনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। এই সংবাদে মহম্মদের বিদ্বেষভাব শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। একে কুমার জগৎ-

সিংহ তাঁর প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার উপর আবার সম্রাটের প্রিয়পাত্র। মহম্মদ ক্ষোভে ক্রোধে হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন এবং জগৎসিংহের উপর বৈরনির্য্যাতন উদ্দেশে সম্রাটের বিদ্রোহী হইয়া পাঠানদিগের সহিত যোগ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই রাত্রেই মহম্মদ আগরা নগরী ত্যাগ করিলেন।

বাঙ্গলায় আসিয়া মহম্মদ পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নিরীহ বঙ্গবাসী প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে তাঁর ততটা আগ্রহ ছিল না। কাজেই প্রথম প্রথম প্রজাদিগের উপর অত্যাচার কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল।

তিমিরাচ্ছন্ন রজনী। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। তড়িদ্দাম মেঘের অন্তরাল হইতে থাকিয়া থাকিয়া বিকাশ পাইতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ; ক্বচিৎ কোন বৃক্ষশাখায় নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালন ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। বর্দ্ধমানের সন্নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলে পাঠানদিগের আড্ডা ছিল; তথায় মহম্মদ কতিপয় পাঠান নেতার সহিত সামরিক বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন। সেই সময় জনৈক গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, জগৎসিংহের অধীনে ন্যূনাধিক দুই সহস্র মোগলসেনা কাটোয়ার সন্নিকটে ছাউনি করিয়াছে। মহম্মদ আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন—তিনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। গুপ্তচরকে বিদায় দিয়া মহম্মদ পুনরায় গুপ্ত পরামর্শে মনোযোগী হইলেন। প্রকাশ্যযুদ্ধে মোগলের সম্মুখীন হওয়াই স্থির হইল। মহম্মদের আদেশে পাঠান সেনাগণ সজ্জিত হইতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র রসদাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত লইয়া সকলে সেই রাত্রেই কাটোয়াযাত্রা করিলেন।

পরদিন কাটোয়ায় পৌঁছিয়া মহম্মদ মোগলশিবির হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী স্থানে স্বীয় শিবির সংস্থাপন করিয়া একাকী মোগল-শিবির উদ্দেশে চলিলেন। শিবিরে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই কুমার জগৎসিংহের সাক্ষাৎ পাইলেন। একাকী এরূপ অবস্থায় মহম্মদকে দেখিয়া কুমার বড় বিস্মিত হইলেন এবং হঠাৎ এরূপভাবে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুর মহম্মদ কুমার জগৎসিংহের মনোভাব অবগত হইবার জন্য প্রথমতঃ তাহাকে নানাপ্রকার মিষ্ট আলাপনে তুষ্ট করিলেন, এবং পরিশেষে তিনি যে সাহাজাদী মেহেরউন্নিসার বিশেষ অনুরোধে কুমারেরই সাহায্যার্থে গুপ্তভাবে আসিয়াছেন, তাহাই বলিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য কুমার জগৎসিংহের ললাটে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিল; তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহম্মদ তাহা লক্ষ্য করিলেন। মহম্মদের বিদ্রোহিতার বিষয় কুমার অবগত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "খাঁসাহেব আসিয়াছেন—বেশ ভালই হইয়াছে। উপস্থিত যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি, এ অঞ্চলে পাঠানদিগের অত্যাচার কিছু কম। এইমাত্র ত্রিবেণী হ'তে পত্র আসিয়াছে—সেখানে কয়েকজন পাঠানদস্যু নিরীহ প্রজাদের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেছে। শুনিতেছি, এখান হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে বিদ্রোহী পাঠানেরা নূতন শিবির সংস্থাপন করিয়াছে; এদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অথচ অন্যদিকে অত্যাচারী পাঠান দস্যুদিগকেও শাসন করিতে হইবে। আমি একাকী কোন্ দিক দেখিব? সেইজন্য মনে করিতেছিলাম, পিতাকে সংবাদ দিয়া আপনাকে আনাইব। যখন আসিয়াছেন তখন ভালই হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, আপনি কিছু সৈন্য লইয়া ত্রিবেণী যাত্রা করুন।" মহম্মদ বলিলেন, "বেশ,—

অদ্যকার মত বিশ্রাম করা যাক্; কল্য যাহা ভাল বিবেচনা হয় করা যাইবে।”

“কি বলছেন, খাঁসাহেব? যার শত্রু দুয়ারে, তার বিশ্রামের অবসর কোথায়? আপনি বোধ হয় জানেন না, দুর্বৃত্ত পাঠানদিগের কি নির্ম্মম অত্যাচার! আপনি বোধ হয় জানেন না, বঙ্গবাসী নিরীহ প্রজাগণ কিরূপ শশঙ্কিতভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছে! এমন অবস্থায় বিশ্রাম? যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হইবে; আর যদি আপনি অসম্মত হন, তাহা হইলে আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আগরায় ফিরিয়া জান এবং আমার পিতাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করুন।”

“সে সংবাদ আপনি ইচ্ছা করিলেই পাঠাইতে পারেন।”

“খাঁসাহেব, এ বিপদ কি শুধু আমার,—আপনারও নয় কি?—অন্নদাতা প্রতিপালক সম্রাট্ আকবর সাহের নয়? খাঁসাহেব! আজ আমি আপনার মুখে নূতন কথা শুনিতেছি! আপনি ত কখনও এমন ছিলেন না?”

“সময় ও অবস্থাভেদে সবই হয়।” জগৎসিংহ স্তম্ভিত হইলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা শিবির হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন; জগৎসিংহ পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। সুযোগ পাইয়া মহম্মদ দৃঢ়মুষ্টিতে জগৎসিংহের কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “নির্লজ্জ কাফের! আমি তোমার সাহায্য করিতে আসি নাই! সাহাজাদী মেহেরউন্নিসার প্রণয়লাভের আশা তোমার ইহ-জীবনের মত মিটাইতে আসিয়াছি।” কুমার জগৎসিংহ মহম্মদের সমকক্ষ

প্রতিদ্বন্দ্বী; তিনি সহসা আক্রান্ত হইয়াও সবলে মহম্মদের নাসিকায় একটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; দর-দর-ধারে শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল; কিন্তু মহম্মদ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্বিগুণবলে জগৎসিংহের কণ্ঠদেশে চাপ দিতে লাগিলেন। জগৎসিংহের প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে সহসা পশ্চাৎ হইতে মহম্মদের মস্তকে সজোরে এক লাঠীর আঘাত পড়ায় মহম্মদ হতচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। জগৎসিংহ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,—ভীমচাঁদ! বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণনেত্রে কুমার ভীমচাঁদের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রভূত বলশালী হইলেও তখনও যেন তাঁহার সম্মুখে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতেছিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কুমার বলিলেন, "তুমি আজ আমায় মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন কিনিয়া রাখিলে।" ভীমচাঁদ সবিনয়ে উত্তর দিল, প্রভু, আমি আপনার দাসানুদাস,—দাস আপন কর্ত্তব্যই করিয়াছে মাত্র। আমি যে উপযুক্ত সময়ে আসিতে পারিয়াছি, এই জন্য ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ।"

"তুমি কেমন করিয়া আসিলে?"

"লোকটার উপর প্রথম হইতেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাহার চাল চলন, কথার ভাব, সমস্তই সন্দেহজনক ব'লে বোধ হ'ল। কাজেই আমি আপনাদের পিছু পিছু এমন ভাবে আস্‌তে লাগ্‌লাম্ যেন আপনারা না দেখ্‌তে পান। আপনি এখন শিবিরে ফিরে যান; আমি এ বিশ্বাসঘাতক কাফেরকে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে তবে যাবো।" জগৎসিংহ শিবির-অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভীমচাঁদ মহম্মদের

সংজ্ঞাশূন্য দেহ তুলিয়া লইয়া পাঠান-শিবির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী আম্রবৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া দিয়া শিবিরে ফিরিল।

কাটোয়ায় মোগল—পাঠনের যুদ্ধ এইরূপেই পরিসমাপ্ত হইল। পরদিন কুমার জগৎসিংহ শুনিলেন, পাঠানেরা সেখান হইতে ছাউনি তুলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পরে তিনি তাহাদের অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া ভীমচাঁদ ও কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে ত্রিবেণী যাত্রা করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণকে স্থলপথে আসিয়া ত্রিবেণীতে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন।

[১৮]

"জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই কেন? যেখানে একের সুখ, সেখানে অন্যের দুঃখ। মানুষ যাহা চায় তাহা পায় না কেন? লোকে বলে, যে যাহা কামনা করে সে তাহা পায়, —আমার মতে লোকের সে ধারণা ভুল, —শুধু মনকে প্রবোধ দিবার জন্য। তাহা যদি হইত তবে আমার ভাগ্যে এত যন্ত্রণাভোগ কেন? আমার বাসনা পূর্ণ হয় না কেন? আমি ত যন্ত্রণা কামনা করি নাই? মানুষে যে কত আশা হৃদয়ে পোষণ করে, আমি ত তাহা করি নাই? শুধু একটী সাধ—আমার সে সাধ কি পূর্ণ হবে না।

শুক্ল-পঞ্চমীর শশধর ডুবিয়া গিয়াছে; আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘগুলির মধ্য দিয়া এক একটী নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরমা শয়নকক্ষের একটী গবাক্ষ খুলিয়া একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া ঐ কথা ভাবিতেছিল। কতক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল; পরিশেষে সরমা একটী দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিল এবং উপাধানে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সহসা যুগপৎ কতিপয় বন্দুকের শব্দে সরমা চমকিত হইল। একে তখন বাঙ্গালায় পাঠানদিগের অত্যাচার-স্রোত পূর্ণবেগে প্রবাহিত; ধনী নির্ধন সকলেই সশঙ্কিত; তাহার উপর এবৎসর এ অঞ্চলে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। কোথাও পুত্রশোকাতুরা জননী বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছেন; কোথাও স্বামীহীনা সদ্যঃবিধবা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন; কোথাও মাতৃহীন শিশু মৃতজননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। হৃদয়ভেদী করুণ আর্ত্তনাদে দিগন্ত মুখরিত। কে কাহার মুখ চাহিবে? বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল; কে কাহার অশ্রু মুছাইবে? যাহার অর্থ আছে, তাহার লোকবলও আছে। যাহার অর্থ নাই; এ সংসারে তাহার কেহই নাই। ধনী চিকিৎসকের আশাপথ চাহিয়া আছেন; দীনহীন মৃত্যুর আশাপথ চাহিয়া আছে। ত্রিবেণীর দরিদ্র শ্রমজীবিগণ যে পল্লীতে বাস করে, সেস্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব কিছু অধিক। অনুপমা ও রবীন্দ্রনাথ দিবারাত্র রোগীসেবায় নিযুক্ত আছেন; যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ সাহায্য করিতেছেন। একদিকে রোগীসেবায় আপনারা নিযুক্ত, অন্যদিকে নিষ্ঠুর পাঠানদিগের অত্যাচার যাহাতে নিবারিত হয়, সেজন্য ভীমচাঁদকে আগরা পাঠাইয়াছেন। পথে কাটোয়ার সন্নিকটে বাদসাহের সৈন্য ছাউনি করিয়াছে সংবাদ পাইয়া ভীমচাঁদ তথায় যাইয়া কুমার জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করে; পরে যাহা ঘটে তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। গৃহরক্ষার ভার রহিম খাঁর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত। গৃহে দাসদাসী ভিন্ন সরমা

একাকিনী। সহসা গভীর রাত্রে গৃহ-সন্নিকটে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া সরমা শিহরিয়া উঠিল। তাহার বুক দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতপদে গবাক্ষ-সন্নিধানে গমন করিয়া ভীতা হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না—কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া দূরাগত কতকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইল। শব্দ যত নিকটস্থ হইতে লাগিল, সরমার আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে রাজপথে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্যের অস্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমে সেই সৈন্যদল নিকটে—অতি নিকটে আসিল। সাজসজ্জা দেখিয়া সরমা বুঝিতে পারিল—তাহারা মুসলমান। হেমেন্দ্রনাথের গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অগ্রগামী একব্যক্তি বংশীধ্বনি করিবামাত্র দেখিতে দেখিতে সেই সৈন্যদল পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া ইতস্ততঃ লুক্কাইত হইল। সরমা প্রমাদ গণিল। 'এইরূপ নিশীথকালে এতগুলি সশস্ত্র সৈনিক এখানে আসিল কেন? নিশ্চয়ই তাহারা কোন অসদভিপ্রায়ে আসিয়াছে। বোধ হয় তাহারাই অত্যাচারী পাঠান। যদি এই অত্যাচারী পাঠানদল তাহাদের গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কি হইবে? একা রহিম খাঁ কি তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিবে? গৃহে আর কেহই নাই,—এ বিপদে কে সদ্যুক্তি দিতে সক্ষম হইবে?"—এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা সরমাকে আকুল করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু সাধারণ বঙ্গ-ললনার ন্যায় সরমার এ বিপদে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না। সাহসে ভর করিয়া সরমা নিঃশব্দপদসঞ্চারে দেউড়ীতে গমন করিল;—সেখানে যাইয়া দেখিল রহিম খাঁ দেউড়ীতে নাই। এইবার সরমা অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইল। সহায়হীনা অভাগিনী সরমা এখন

একাকিনী। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। মনে নানা বিষয়ক চিন্তা একে একে উদিত হইতে লাগিল শেষে অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কক্ষে গমন করিল এবং নিদ্রিত শিশুকে বক্ষে লইয়া পুনরায় গবাক্ষ-সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার বন্দুকের শব্দ হইল—আবার শব্দ—এইবার ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল—ঘরের সার্সী ভাঙ্গিয়া পড়িল—ভিত্তিগাত্র হইতে চূণ বালীর চাপ খসিয়া পড়িল—গবাক্ষদ্বার দিয়া গুলি আসিয়া আলমারীর কাচ চূর্ণীকৃত করিল। সরমা প্রাণপণে শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। আজ সরমা তাহার সমস্ত শক্তি, এমন কি প্রাণ দিয়াও, শিশুকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প। সরমা দেখিল, ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতেছে, গুলি বর্ষিত হইয়া নানাবিধ দ্রব্যজাত চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে, তথাপি শত্রু গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছে না। সরমার সন্দেহ হইল—ভাবিল, নিশ্চয়ই শত্রুদলকে কেহ বাধা দিতেছে। সহসা গৃহের পশ্চাদ্দিক্ হইতে কয়েকজন মুসলমান-সৈন্য দ্বার ভাঙ্গিয়া বাগানের পথে গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দ্বার ভাঙ্গিয়া সৈন্যগণ উপরে উঠিল। ক্রমশঃ তাহারা সরমার কক্ষদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। সরমা বহির্দ্দিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল—আবার দ্বারভঙ্গের শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সরমার কক্ষমধ্যে আসিল,—সরমাকে বারান্দায় দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য দুইজন তাহার নিকটে গেল। সহসা বুভুক্ষু শার্দ্দূল দর্শনে ভীতা হরিণীর ন্যায় সরমা পলায়নপরা হইল বটে, কিন্তু যাইবে কোথায়? একজন মুসলমান সৈনিক ক্ষিপ্রপদে আসিয়া শিশুটীকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল, অপর একব্যক্তি আসিয়া

যেমন সরমাকে ধরিতে যাইবে, সে উন্মত্তার ন্যায় সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িল। শীকার হস্ত হইতে পলাইল দেখিয়া তাহারা অবশিষ্ট সৈন্যগণের অনুসন্ধানে আসিল। সেখানে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা ভীত ও চমকিত হইল। তাহারা দেখিল, বাহিরের সৈন্যগণের মধ্যে বাণবিদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত; কতকগুলি আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহারা তাহাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই কোথা হইতে একটী তীর আসিয়া একজনের বক্ষে বিদ্ধ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তি ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরক্ষণেই আর একটা তীর আর একজনের চক্ষে বিদ্ধ হইল। তখন তাহারা অনুমান করিল, নিশ্চয়ই শত্রুদল অলক্ষ্যে থাকিয়া এই বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহারা আত্মরক্ষার্থ যে যে দিকে পাইল পলাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে অদূরে পুনরায় অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে কতিপয় অশ্বারোহী পুরুষ হেমেন্দ্রবাবুর গৃহসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাগত অশ্বারোহী পুরুষগণের মধ্যে ভীমচাঁদ অগ্রবর্ত্তী এবং তাহার পশ্চাতে কুমার জগৎসিংহ। ভীমচাঁদ গৃহসমীপে আসিয়াই হঠাৎ যেন কি দেখিয়া অশ্ব-বল্গা সংযত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কুমার জগৎসিংহও আপন অশ্ববল্গা সংযত করিলেন। ভীমচাঁদ ত্বরিৎপদে অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ভীমচাঁদ দেখিল—সরমার কুসুম-সুকুমার রক্তাক্ত দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত। সরমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভীমচাঁদ সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। অনতিবিলম্বে কতিপয় সৈন্যসমভিব্যাহারে কুমার জগৎসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া কুমার যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তিনি ক্ষোভে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁর চক্ষের সম্মুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সরিয়া যাইতেছে। ম্লানচন্দ্র যেন শুভ্রমেঘের অন্তরাল হইতে থাকিয়া থাকিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছে,—নক্ষত্রমালা যেন ঘৃণায় একে একে মুখ লুকাইতেছে,—এক একটী নিশাচর পক্ষী যেন তাঁহাকে কর্কশস্বরে তিরস্কার করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছে,—যেন বলিতেছে, "জগৎসিংহ! শুধু তোমার দোষে আজ অভাগিনীর এই দুর্দ্দশা। যখন আসিলে, তখন আর একটু পূর্ব্বে আসিলে না কেন?" সরমা! তোমার অদৃষ্টে সুখ নাই; ইহাতে কুমারের অপরাধ কি?

[১৯]

সরমার এরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে কুমার জগৎসিংহ নিতান্ত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু অনুপমার চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু দেখা গেল না। তিনি যেন চিরানন্দময়ী। তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই এক অভিনব স্বর্গীয় জ্যোতিতে বিভাসিত। রবীন্দ্রনাথও হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। তিনি অনুপমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। অনুপমা আপন সঞ্চিত অর্থে একটী অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহার গৃহে পালিত শিশুকে যথারীতি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করতঃ তাহাকে তাঁহার ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া কুমার জগৎসিংহকে তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কুমারও সানন্দে

তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং উপযুক্ত লোকের হস্তে সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে অনুপমা ভীমচাঁদের উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত তীর্থযাত্রা করিলেন।

আগ্রায় প্রত্যাগমন করিয়া কুমার জগৎসিংহ একদিন সম্রাট-নন্দিনী মেহেরউন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাটোয়া ও ত্রিবেণীর ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সরমার আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি মনে মনে যে চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছিলেন। সম্রাট-নন্দিনী মেহেরউন্নিসা কুমারের স্বভাব জানিতেন; তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, যে কুমার জগৎসিংহ সরমাকে ভাল বাসিতেন; কিন্তু তাহার আকস্মিক মৃত্যু কুমারের হৃদয়ে বিষম ঝড় তুলিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। অগত্যা তিনি তাঁহাকে আর কোন কথা বলিলেন না। নিরাশার বিষম আঘাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিল। মনের ব্যথা প্রকাশ না করিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে পুড়িতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল এবং কয়েক মাসের মধ্যে হৃদ্‌-রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ভোগ ঐশ্বর্য্যের কোলে পালিতা সম্রাট-নন্দিনী মেহেরউন্নিসার জীবনকুসুম মুকুলেই শুখাইয়া গেল। মৃত্যুকালে তিনি কুমারকে বলিয়াছিলেন, "কুমার, আমি তোমায় ভালবেসে নিরাশা বুকে নিয়ে চল্‌লাম; কিন্তু স্থির জেনো, য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা।" কিন্তু তখন আর প্রতিকারের উপায় কি? –শুধু কুমার জগৎসিংহের নয়নযুগল হইতে কয়েক

বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়া সম্রাট-নন্দিনীর শেষ কথার উত্তর দিয়াছিল মাত্র।

উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে হরিদ্বারের পূতসলিলা জাহ্নবী-তীরে একদিন এক সন্নাসী ও তাঁহার এক সঙ্গিনার সহিত কুমার জগৎসিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুমার তাঁহাদের দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ;—সেই সন্ন্যাসী রবীন্দ্রনাথ, আর তাঁর সঙ্গিনী অনুপমা।

অংশীদার

এত চেষ্টা করিয়াও ডারমটের আর্থিক অবস্থা কিছুতেই স্বচ্ছল হইল না। ডারমট ওব্রেনকোর বাসস্থান আয়র্লণ্ডে। পৈত্রিক বিষয়-আশয় তেমন কিছু ছিল না যাহাতে ডারমটের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে; ডারমট সুপুরুষ যুবক; কিন্তু রূপ থাকিলেই যে তাহা তাঁহার অর্থাগমের পথে আনুকূল্য করিবে, এরূপ কোন কথা নাই। যাহা হউক, ডারমটের ভাগ্যে রূপের আনুকূল্যে এতদিনের পর একটী সুযোগ ঘটিল। সেখানকার একটী প্রসিদ্ধ থিয়েটারের ম্যানেজার তাঁহাকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে ডারমট ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলেন। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি কোন কাজকর্ম্ম করেন?"

"আজ্ঞে না,—আমি উপস্থিত বেকার।"

"আমরা উপস্থিত একটী নূতন নাটক অভিনয় করিবার ইচ্ছা করিতেছি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে এবং যদি আপনি আপনাকে অভিনয়-কার্য্যের যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে আপনার সুন্দর চেহারার অনুরূপ উক্ত নাটকের নায়কের অংশ বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে পারিলে আমি আপনাকে প্রতিসপ্তাহে ৪ পাউণ্ড করিয়া আপনার পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রদান করিতে পারি।" ডারমট কি ভাবিয়া ম্যানেজারের কথায় সম্মত হইলেন। প্রথম অভিনয়-রজনীতে নায়কের ভূমিকায় ডারমট অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষতঃ

তাঁহার সুন্দররূপ এবং নায়িকার সহিত প্রেম, বিরহ, দীর্ঘবিরহান্তে মধুর মিলন প্রভৃতি দৃশ্যে তাঁর স্বাভাবিক লজ্জানম্র চাহনী, হাবভাব, অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতি অতি সুদক্ষ অভিনেতা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দর্শকবৃন্দের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন কি, যতদিন উক্ত নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছিল, ততদিন নানাস্থান হইতে সুন্দরী কিশোরীগণের প্রণয়-পত্রিকা ও বিবাহের প্রস্তাব-জ্ঞাপক পত্রাদি ডারমটের হস্তগত হইয়াছিল। একখানি নাটক চিরকাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারে না; তত্রাপি এই নাটকখানি সাধারণের চক্ষে এরূপ সুন্দররূপে অভিনীত হইতেছিল যে, অন্যূন দেড়শত রজনী ইহার অভিনয় হইবার পর বন্ধ হইল, এবং নূতন নাটকে ডারমটের উপযোগী অংশ না থাকায় তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য অবসর লইতে হইল।

ডারমট আবার বেকার। দুরদৃষ্ট বেচারার সহিত কি ক্রূর পরিহাস করিতেছে।

বেলা তৃতীয়প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। মলিন-সূর্য্য-কিরণ ব্যথিতের ন্যায় মাঠের একপার্শ্বে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে। কচিৎ দূরে ওক বৃক্ষের পত্রাভ্যন্তর হইতে কোকিলের স্বর থাকিয়া থাকিয়া শ্রুত হইতেছে। সহরের প্রান্তভাগে ডারমটের গৃহ। গৃহটী যেন কি একটা অজানিত দুঃখে মুহ্যমান হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে। ডারমট তাঁহার ড্রয়িং-রূমে বসিয়া নিবিষ্টমনে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক ভৃত্য ডারমটের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্রিকা প্রদান করিল। ডারমট সংবাদপত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, পত্রিকাখানির বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া

পাঠ করিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখে একটু প্রফুল্লতার চিহ্ন লক্ষিত হইল। পত্রপাঠান্তে তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জনৈক ভৃত্য আসিয়া দর্শন দিল। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "দেখ, আমি আজ একটু স্থানান্তরে যাইব, আসিতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইতে পারে; তুমি এখনই আমার যাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি ঠিক করিয়া দাও।"—পরে তিনি গৃহাদি পর্যবেক্ষণের জন্য তাহাকে অন্যান্য উপদেশ দিয়া পত্রানুযায়ী তাঁহার বন্ধু ডাক্তার মিক্লেথওয়েটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ডারমট শুনিয়াছিলেন যে, ডাক্তার মিক্লেথওয়েট নিজের কারবারের জন্য একজন অংশীদারের অন্বেষণ করিতেছেন; সুতরাং এরূপ আকস্মিক আহ্বানে মনে করিলেন, ডাক্তার মিক্লেথওয়েট তাঁহাকেই উপযুক্ত অংশীদার স্থির করিয়া তাঁহার অভিমত জানিবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই কথা ভাবিতে ডারমটের অধর-প্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বন্ধু-সহবাসে দুইদিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল, অথচ ডারমট যে কি কারণে আহূত হইয়াছেন, সে বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তৃতীয় দিনে প্রাতরাশের পর ডাক্তার ডারমটকে বলিলেন,—"ভাই দেখ, তুমি বোধ হয় জাননা, আমি তোমায় কি জন্য আহ্বান করিয়াছি। আমার অংশীদার আমেরিকায় চলিয়া যাওয়ায় আমি একলা পড়িয়া গিয়াছি; সমস্ত কাজ একাকী শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সেই জন্য আমার কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে এমন একজন অংশীদারের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম,

তুমি এখন বেকার বসিয়া আছ ; সেই জন্য তোমাকেই আমার সহকারী অংশীদাররূপে নির্ব্বাচন করিব বলিয়া মনে করিয়া তোমায় আহ্বান করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার কোন আপত্তি আছে কি ?"

"তা বেশ ত, এতে আর আমার আপত্তি কি ? তবে একটা কথা, আমি তোমার কাজের কতটুকু উপযুক্ত হইতে পারিব, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে ; কারণ এ কাজে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।"

"মানুষ কি একেবারেই কাজের লোক হয় ? শিখিলে কোন কাজই শক্ত নয় ; চেষ্টা করিলে কাজের লোক মিলিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসী লোক পাওয়া বড়ই কঠিন। তুমি সম্মত হইলে, আমার বিশ্বাস আছে, আমি তোমাকে কাজের লোক করিয়া লইতে পারিব।"

"তা যদি পার, তাহ'লে আর আমার আপত্তি কি ?"

"তবে আজ থেকেই কাজে প্রবৃত্ত হও। একটা কথা বলিয়া রাখি, কাজের লোক হইতে হইলে কোন বিষয়ে হীনতা বোধ করিলে চলিবে না। আজই তোমায় একটী কাজের ভার দিব ; আশা করি, তুমি সে ভার টুকু লইতে আপত্তি করিবে না।"

"কাজের কথাটাই বল,—অত ভূমিকার প্রয়োজন কি ? আমি কি বলিতেছি—করিব না ?"

"বেশ—বেশ ! এখান থেকে তিন মাইল দূরে আমার একটী রোগিণী আছেন। আজ আমি বড় ব্যস্ত, এত দূরে যাইতে পারিব না,—অথচ রোগিণীর অবস্থা জানাও বিশেষ আবশ্যক। তুমি যদি আমার পরিবর্ত্তে এই ঔষধটী তাঁহাকেদিয়া আসিতে পার এবং তাঁহার অবস্থা জানিয়া

আসিতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমার বাইশিকেলটী এখানে আছে ইচ্ছা করিলে লইয়া যাইতে পার। কি বল?”

“বেশ, তাতে আর আপত্তি কি? এখনই যাইতে হইবে?”

“হাঁ—এখনই। আর একটা কথা বলিয়া দিই,—তুমি নূতন লোক, বোধ হয় তার বাড়ী চেন না। তুমি বরাবর এখান হইতে দক্ষিণমুখে যাও, প্রায় মাইল তিনেক যাইয়া ডানদিকে একটী বাগান দেখিতে পাইবে। ঐ বাগানের পূর্ব্বদিকে হলদে রংয়ের একটী বাঙ্গালা; সেই বাঙ্গালায় ঐ রোগিণীর ভগ্নী থাকেন। প্রথমে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেই তিনি তোমায় রোগিণীর বাড়ীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে সেই বাড়ীর অন্য কোন লোক তোমায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে।”

ডারমট তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, এমিলির বাড়ীর সম্মুখীন হইবামাত্র ফটকের সম্মুখে এমিলিকে দেখিতে পাইলেন। এমিলি ডারমটকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি মহাশয়, আপনি কা'কে চান?”

“মিস এমিলিকে।”

“আপনার উদ্দেশ্য কি বলিতে পারেন? আমারই নাম এমিলি।”

“আপনার ভগ্নী কি পীড়িতা?”

“হাঁ”—

“ডাক্তার মিক্লেথওয়েটকে বোধ হয় জানেন?”

“হাঁ, তিনিই আমার ভগ্নীর চিকিৎসা করিতেছেন।”

“ডাক্তার মিক্লেথওয়েট আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁর একজন

অংশীদার, বিশেষ কার্য্যবশতঃ তিনি আজ আসিতে না পারায় আমাকে পাঠাইয়াছেন।”

“বেশ, বেশ,—ঔষধ পাঠাইয়াছেন কি?”

“হাঁ—আপনার ভগ্নী এখন কেমন আছেন?”

“ডাক্তার মিক্লেথওয়েট বোধ হয় রোগিণীর অবস্থার বিষয় সমস্তই বলিয়াছেন; তবে বেশীর ভাগ—পূর্ব্বাপেক্ষা চাঞ্চল্য কিছু বেশী আর মস্তিষ্কের সেই কম্‌প্লেণ্টটা কিছু বেশী ব’লে বোধ হচ্ছে, আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ। তা’ চলুন একবার তাঁকে দেখবেন—”

এমিলির কথায় ডারমট বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, “তাইতো, ডাক্তারের অংশীদার বলিয়া পরিচয় দিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি!—মিস এমিলির মনে ধারণা হইয়াছে যে, আমারও চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। এখন আমি উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। এখন ডাক্তার ভাবিয়া আমায় যেরূপ খাতির ও সম্মান দেখাইতেছেন, নিজের যথার্থ পরিচয় দিলে হয়-ত তাঁহার মনের ভাব অন্যরূপ হইতে পারে। অথচ ডাক্তার রোগিণীর অবস্থার বিষয় আমায় কিছুই বলেন নাই। অধিকন্তু মিস এমিলি যেরূপ সংক্ষেপে রোগিণীর অবস্থার ইতরবিশেষের বিষয়টুকু বর্ণনা করিলেন, তাহাতে রোগিণীর অবস্থা সম্যক অবগত হওয়াও দুঃসাধ্য। ইনি যদি এবিষয়ে কোন প্রশ্ন করেন, তাহা হইলেও অপ্রস্তুত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে অংশীদার বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজের যতটুকু মান বাড়াইয়া তুলিয়াছি, এখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হইলে নিজের হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। আর একটা কথা, ডাক্তারি করাও সহজ কাজ নয়, মানুষের জীবন

মরণ লইয়া খেলা! উঃ কি কঠোর সমস্যা! জীবনে কখনও এরূপ বিপদে পড়ি নাই;—এখন কি করি? ডাক্তারের কথায় কেন আসিলাম? কে জানিত, এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইবে? এখন এদের হাত হইতে নিস্তার পাইলেই বাঁচি। ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ গোলযোগের মধ্যে আসিব না।” ডারমট এইরূপ অনেক ভাবিলেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সহসা এমিলির প্রশ্নে তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। এমিলি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবচেন? রোগিণীর অবস্থা শুনিয়া একটু ভাবনায় পড়িয়াছেন বোধ হয়?”

ডারমট নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন, “হাঁ—না—তা—বটে।”

এমিলি বলিলেন, “একবার তাঁকে দেখিবেন আসুন।”

ডারমট জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার ভগ্নী কি এ বাড়ীতে থাকেন না? আর কতদূর যাইতে হইবে?”

“নিকটেই—ঐ সামনের গলির মোড়ে—আসুন।” এইকথা বলিয়া এমিলি অগ্রে চলিলেন এবং ডারমট মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিলেন। বাড়ী বেশ সুন্দর। উঠানে একটী সুন্দর ফুলবাগান, ঠিক মাঝখানে ডিম্বাকৃতি খানিকটা স্থান মখমলের ন্যায় কোমলতৃণাচ্ছাদিত। বেশ পরিষ্কার রাস্তাটী সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত হইয়া ঐ তৃণাচ্ছাদিত স্থানটুকু বেষ্টন করিয়া আছে। ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের ফুল ফুটিয়া আছে। সম্মুখেই গাড়ী-বারান্দা। নানাবিধ সুন্দর লতা গাড়ী-বারান্দার স্তম্ভ

বেড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমে তাঁহারা একটী হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। হলঘরটী বেশ সাজান। হলঘরের পাশে একটী ছোট ঘরের মধ্যে উপরে যাইবার সিঁড়ি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠিতেই ডারমটের পা কাঁপিতে লাগিল।—বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

উপরের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে একটী সুন্দর পালঙ্কোপরি রোগিণী শায়িতা। প্রথমে এমিলি রোগিণীর নিকট ডারমটের পরিচয় দিলেন, পরে রোগিণীকে দেখিবার জন্য ডারমটকে অনুরোধ করিলেন। ডারমট ধীরে ধীরে যাইয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। ডারমট বিশেষ সাবধানে অথচ একটু কম্পিত স্বরে রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছেন?"

"বিশেষ ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। মাথার সে কমপ্লেণ্টটা একটু বাড়িয়াছে, আর বুক-ধড়ফড়ানিটাও একটু বাড়িয়াছে,—আর একটু কফের——"

রোগিণীর কথা শেষ না হইতে এমিলি বলিলেন, "আপনি একবার ওর বুকটা পরীক্ষা করুন; কাল একটু বেদনার কথাও বল্‌ছিল; না লিলি?" রোগিণী বলিলেন, "হাঁ, বুকে একটু বেদনাও কাল বোধ হচ্ছিল, আপনি একবার—"

আবার রোগিণীকে বাধা দিয়া এমিলি বলিলেন, "ওটা বোধ হয় কিছু নয়; কাশীটা একটু বেশী হয়েছিল বলেই ঐ বেদনাটুকু দেখা দিয়াছে। আর—হাঁ লিলি, তোমার চোখ জ্বালা করে নয়? ওটা বোধ হয় পিত্তের দোষ—কি বলেন? বুক-ধড়ফড়ানিটা শুধু দুর্ব্বলতার জন্য—কেমন? মাথার কমপ্লেণ্টটাও বোধ হয় তাই?

ডাক্তার মিক্লেথওয়েট বলেছিলেন, ওকে একটু একটু বারান্দায় পায়চারী কর্ত্তে। আপনি কি বলেন? আমার বোধ হয় অনিদ্রা ও অজীর্ণতাই ওর রোগের মূল; আপনি কি বলেন?" প্রশ্নবৃষ্টি থামিল। ডারমট সকল প্রশ্নের উত্তরই একরূপ আন্দাজে হাঁ, না, তা বৈ কি, মন্দ নয়, প্রভৃতি কয়েকটী কথায় সংক্ষেপে প্রদান করিলেন। এমিলি আবার তাঁহাকে রোগিণীর বুক পরীক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে ডারমট তাড়াতাড়ি নিজের পকেট অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "তাইতো বড়ই ভুল করিয়াছি—ষ্টেথিসকোপটী আনিতে ভুলিয়াছি—তাইতো!"

"আজ তবে থাক—কালই না হয় পরীক্ষা করিবেন।"

"তাই হবে। আজ আমি তবে আসি;—ঔষধটী যেন এঁকে ব্যবস্থামত খাওয়ান হয়।" ডারমটের কথায় রোগিণীর গোলাপনিন্দিত অধরে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ডারমট প্রথমে রোগিণীর মুখখানি যেমন সুন্দর দেখিয়াছিলেন, এখন আবার দেখিলেন তাহা অপেক্ষা আরও সুন্দর। ডারমট চিন্তিতমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বৈকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া দুই বন্ধুতে গল্প করিতেছিলেন; নানা কথার পর ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, সকালে যে রোগিণীকে দেখিবার জন্য গিয়াছিলে, কি রকম দেখিলে?" ডাক্তারের প্রশ্নে ডারমট একটু হাস্য করিলেন এবং তিনি তাঁহার অংশীদাররূপে নিজের পরিচয় দিয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে কিরূপে নিজের সম্মান বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। ডাক্তার মিক্লেথওয়েট তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—

"তুমি ত থিয়েটারের ফেরৎ, তোমার পক্ষে এরূপ অভিনয় করা খুব সহজ; কিন্তু একটা কথা, এ বিষয়টী যদি লোকসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে একটা গোলযোগ হইতে পারে। যাই হোক, কাহাকেও একথা জানাইও না।"

"আমি না হয় জানাইলাম না; কিন্তু তাহারা হয়ত অপরের কাছে বলিতে পারে। তাহাদের মুখ কেমন করিয়া বন্ধ করিব?"

"সেজন্য চিন্তা করিও না—আমি তাহা সারিয়া লইতে পারিব। আমি আগামী কল্য একবার রোগিণীকে দেখিতে যাইব; তাহা হইলে তোমার উপর তাহাদের ধারণা কিরূপ, তাহাও বুঝিতে পারিব।"

সে দিন আর এবিষয়ে তাঁহাদের কোন কথাবার্ত্তা হইল না। পরদিন ডাক্তার মিক্লেথওয়েট যথাসময়ে রোগিণীকে দেখিয়া আসিলেন; আসিয়াই গম্ভীরভাবে ডারমটকে বলিলেন, তুমি দেখ্‌ছি আমার সমস্ত পশার নষ্ট করবে?" ডারমট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

"তুমি যেরূপ ভাবে চিকিৎসা-দক্ষতার ভাণ দেখাইয়াছ, তাহাতে তাহারা রোগিণীকে আরোগ্য করিবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে তোমার উপ-রই নির্ভর করিতে চায়, অথচ এবিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তুমি যে এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সাধারণে জানিবে তুমি একজন অংশীদার; অথচ এ ক্ষেত্রে যদি তোমার বদনাম হয়, তাহা হইলে আমাদের ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যে আমারও পশার নষ্ট হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?"

ডারমট চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, " সেজন্য

তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি সামলাইয়া লইতে পারিব। আজ কাল আমার মত অনেক ভুঁইফোড় ডাক্তার আছে। তুমি একজন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ডাক্তার, তোমার কাছে উপদেশ পাইলে আমিও একাজের উপযুক্ত হইতে পারিব।"

"বেশ, পার ভালই—কিন্তু খুব সাবধান। হাঁ, কাল থেকে ওখানে তোমাকেই যাইতে হইবে—কেমন পারিবে ত?"

ডারমট ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম চিন্তা, যে কার্য্যে জীবণ মরণ লইয়া খেলা, সে কাজে হাত দিবেন কি না? প্রথম একবার অগ্রসর হইয়া আবার পশ্চাদপদ হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। অধিকন্তু এক্ষেত্রে যখন তাহারা ডাক্তার মিক্লেথওয়েট অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সম্মান ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়াছেন, তখন কেমন করিয়াই বা পিছাইবেন? দ্বিতীয় চিন্তা—লিলির সুন্দর মুখখানি। ডারমট যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে ডারমট লিলির গৃহে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, সেদিন ডারমট ষ্টেথিসকোপটী সঙ্গে লইতে ভুলিয়া যান নাই। সেদিন এমিলি, লিলির গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। ডারমটকে দেখিয়া লিলি প্রসন্ন-বদনে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। ডারমট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছেন?"

"আজ ভাল আছি, তবে বুক-ধড়ফড়ানিটা কিছুই কমে নাই।"

"ওটা—দুর্ব্বলতার জন্য, বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। বুকের বেদনাটা কেমন?"

"সেটা বেশ বুঝিতে পার্চ্ছিনা, আপনি পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। হাঁ, আজ আপনি ষ্টেথিস্কোপ আনিয়াছেন ত?"

"একদিন হঠাৎ ভুল হইয়াছে বলিয়া কি রোজ রোজ ভুল হইবে?" ডারমট পকেট হইতে ষ্টেথিস্‌কোপ বাহির করিলেন। লিলি বলিলেন, "অভ্যাস না থাকিলেই ভুল হয়।" লিলির বিদ্রূপটুকু ডারমটের কাণে যেন কেমন কেমন লাগিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন—"কেন বলুন দেখি?"

"কেন আবার কি? এ ত সত্য কথা। আপনার অভ্যাস ছিল না, তাই ভুল হয়েছিল। নইলে কি আর ডাক্তারের ষ্টেথিস্‌কোপ আন্‌তে ভুল হয়? ধরুন, যেমন জেলে মাছ ধরতে গেল, অথচ জাল নিয়ে যেতে ভুলে গেল; পোষ্টম্যান চিঠিবিলি কর্ত্তে গেল, অথচ ব্যাগ নিয়ে যেতে ভুলে গেল; চাষা জমিতে চাষ দিতে গেল অথচ লাঙ্গল নিয়ে যেতে ভুলে গেল। এগুলোও যেমন আশ্চর্য্য ভুল বলে মনে হয়, তেমনই ডাক্তারের ষ্টেথিসকোপটা ভুল হওয়াও আশ্চর্য্য।" ডারমট কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। লিলি আবার বলিলেন, "মিষ্টার ডারমট, আপনি আমার নিকট অপরিচিত নহেন; যদি পূর্ব্বে আপনাকে আমি না দেখিতাম, তাহা হইলে থিয়েটারে নায়কের অংশের ন্যায় এখানে ডাক্তারের অংশও অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিতে পারিতেন। যাহা হউক, আপনি এজন্য দুঃখিত হইবেন না।"

সহসা ভীষণ অজগর দর্শনে বা বিনামেঘে বজ্রাঘাতে মানুষ যতটা সন্ত্রস্ত ও চমকিত না হয়, ডারমট তদপেক্ষা অধিক চমকিত হইলেন। যাহা কখনও কল্পনায় মনোমধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই, আজ তাহা চক্ষের উপর ঘটিয়া গেল! ডারমট লজ্জায় নতমুখ হইয়া গেলেন, তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। লিলি আবার বলিতে

লাগিলেন, "মিষ্টার ডারমট, আপনার ধারণা—আমি রোগী ; কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমার এ রোগের ভাণ মাত্র। সহজে আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ জানিয়া আমিই আমার নূতন ভগ্নীপতি ডাক্তার মিক্লেথওয়েটের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আপনাকে এখানে আনিয়াছি। আমি ভাবিয়াছিলাম একরূপ ; কার্য্যগতিকে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। আপনি আমায় সেজন্য ক্ষমা করিবেন।" ডারমট এতক্ষণে মুখ তুলিয়া লিলির দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, মুখখানি বড় সুন্দর, নীলোৎপলসদৃশ বড়বড় চোখ দুটী জল-ভরা। তাঁহার লজ্জা, ক্রোধ, অভিমান, সব কোথায় ভাসিয়া গেল, তিনি পলকহীন চক্ষে লিলির মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পাশের কক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে ডাক্তার মিক্লেথওয়েট ও তৎপত্নী এমিলি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে ডাক্তার বলি-লেন, বল দেখি এমিলি, ডারমট আমার অংশীদারের যোগ্য কি না? তোমরা একবৃন্তে দুটী ফুল—এমিলি ও লিলি ; একটী আমার অংশে, আর একটী আমার বন্ধু ডারমটের অংশে।" লিলির গোলাপগণ্ড লাল হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, শুভদিনে ডারমটের সহিত লিলির বিবাহ হইয়া ছিল।

রোমান্সের ঠিক্‌রে।

বাপের যথেষ্ট পয়সা আছে, গাড়ী আছে, জুড়ি আছে, কলিকাতায় বাড়ী আছে, কাজেই আমার পড়িবার ভাবনা কি? বাড়ীতে আমার পড়াইবার জন্য দুইজন টিউটার। একজন সন্ধ্যায় আসিয়া ইংরাজী পড়াইয়া যান, সকালে আর একজন আসিয়া গণিত কসান। বৈকালে স্কুলের ছুটীর পর বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া থাকি না, প্রত্যহ ফিটন চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাই। সবে মাত্র নয় বৎসরে পড়িয়া কলিকাতার একটী নামজাদা স্কুলে সপ্তমশ্রেণীতে পড়িতেছি।

আমি যখন গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাই, ঠিক সেই সময়ে আমাদের প্রতিবেশী চারুবাবুর ছোট মেয়ে মিনি ও তাহার ভ্রাতা ভূতো মোটরে চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যায়। ভূতোর সহিত আমার খুব ভাব, কারণ সে আমার ক্লাশ-ফেণ্ড; ক্রমে ক্রমে মিনির সঙ্গেও আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। মিনিকে না দেখিলে থাকিতে পারিতাম না, তাহার সহিত কথা না কহিলে আমার মন বড়ই খারাপ হইয়া উঠিত। এক কথায় মিনিকে আমি ভালবাসিয়া ফেলিলাম। তাহাকে না দেখিলে এক এক মিনিট আমার কাছে এক একটী বৎসর বলিয়া মনে হইত (কারণ এখনকার মত যুগের আইডিয়া তখন ছিল না)। স্কুলের পাঁচ ঘণ্টা যে কিরূপ কষ্টে, কিরূপ উদ্বেগে কাটাইতাম, তা' আর বলিতে পারি না (মনে থাকিলে হয় ত বলিতাম)। বিশেষ মনোযোগ-সহকারে অর্থাৎ খাইনিউট্লি দেখিলাম, মিনিও আমার প্রতি অনুরক্তা; সেও বলিত

স্কুলে তার মন টিঁকেনা, কেবল আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, আমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করে, এক এক মিনিট তার এক এক মাস বলিয়া মনে হয় (কারণ সে আমার চেয়ে ছোট ছিল, বোধ হয় সেই জন্য তার বৎসরের আইডিয়া ছিল না)। যাহা হউক, আমাদের দু'জনের মধ্যে খুব ভালবাসা অর্থাৎ 'লভ' জন্মিয়া উঠিল। আমি সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতাম যদি বড় হইয়া আমার বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে মিনিকেই বিবাহ করিব, নচেৎ চিরকুমার হইয়া থাকিব। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া আমার মন বড় খারাপ হইত ; আমি ব্রাহ্মণ আর মিনি কায়স্থ, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে ? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, অচিরেই আমার সে সন্দেহটা দূর হইয়া গেল। ইদানীং আমার মত ছেলে পৃথিবীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনেক বিষয়ের খবর বলিতে পারে। বাড়ীতে কোনরূপ কায়ক্লেশে বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া স্কুলের খাতায় নাম লিখাইতে পারিলেই গণিত বলুন, দর্শন বলুন, ইতিহাস বলুন, ভূগোল বলুন, সবই পড়িতে হয়। আমার ভাগ্যেও সেই সুযোগ ঘটিয়াছে। আমার গৃহশিক্ষক মহাশয় একদিন আমায় ইতিহাস পড়াইতেছিলেন,—আদিকালে বৈবস্বত মনুর সময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, এই বিষয়টী বুঝাইতেছিলেন। বিষয়টির কিছু বুঝি না বুঝি, শুধু অসবর্ণ বিবাহ কাহাকে বলে তাই বুঝিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তদুত্তরে জাতিবিচার না মানিয়া যা'কে ইচ্ছা তা'কে বিবাহ করাকেই যে অসবর্ণ বিবাহ বলে, শিক্ষক মহাশয় তাহাই বুঝাইয়া দিলেন। ব্যস—আর যায় কোথায় ? আর আমার কিছু বুঝিবার আবশ্যক হইল না,—আমার হৃদয় আনন্দে ড্যান্স্ করিয়া উঠিল ! ভাবিলাম, আগে যখন এইরূপ হইত, তখন—

এখন এরূপ প্রথা চলিবে না কেন? মিনির সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে। পরদিন গড়ের মাঠে গিয়া মিনিকে সব কথা বলিলাম। মিনি বড় আনন্দিত হইল। সেই দিন হইতে আমাদের ভালবাসা আইসক্রীম হইতে আইসের মত জমিয়া উঠিল। যখন বাড়ীতে থাকিতাম, একটু সুযোগ পাইলেই মিনিকে দেখিতে মিনিদের বাড়ী ছুটিতাম।

মিনিও সুযোগ পাইলে আমাদের বাড়ী আসিত। বাবা দেখিলেন আমার পড়াশুনা ভাল হইতেছে না। গৃহশিক্ষক মহাশয়দিগকে বলিয়া দিলেন, ললিতের উপর একটু নজর রাখিবেন। (জানি না পিতাঠাকুর মহাশয় আমাদের লভের কথা বুঝিয়াছিলেন কি না।) সেই দিন হইতে শিক্ষকেরা অত্যন্ত ষ্ট্রীক্ট্‌ হইলেন। হোম-টাস্ক্‌ বাড়াইয়া দিলেন, হাতের লেখা দুপাতার স্থানে ১০ পাতা করিয়া দিলেন, মাল্টিপ্লিকেশন পাঁচটার স্থানে পনরটা দিলেন, ট্রানস্লেশন পাঁচ ছত্রের স্থানে পনর ছত্র করিয়া দিলেন, ভূগোল শুধু এসিয়ার দ্বীপ না দিয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলাম, শিক্ষক মহাশয়ও আমাদের ভালবাসার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি ত উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, মিনিকে ভালবাসিতে হইলে অগ্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদিগের মন রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বাবা একবার চটিয়া গেলে আমাদের বিবাহের পক্ষে হয় ত গোলযোগ হইতে পারে। কাজেই শিক্ষকের মন রাখিবার জন্য তাঁহার দেওয়া টাস্ক্‌ যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিতে লাগিলাম। এইরূপে চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

আজ কাল মিনি আর স্কুলে যায় না, গড়ের মাঠেও বড় একটা বেড়াইতে যায় না। দুই চারি দিন গড়ের মাঠে গিয়া যখন দেখিলাম

মিনি আর আসে না, তখন আমিও গড়ের মাঠে যাওয়া বন্ধ করিলাম। সুবিধা-মত মিনিদের বাড়ী যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিতাম। বলা বাহুল্য, গৃহ-শিক্ষকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিতাম না।

একদিন মিনির কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা আমার মনে প্রশ্ন উঠিল,—"আচ্ছা, আমিত রোজই মিনিকে দেখিতে যাই, মিনি ত আর আমাকে দেখিতে আসে না?" পদার্থদর্শনে পড়িয়াছিলাম "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে"। তাই নিজেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইলাম— মিনি চুম্বক, আমি লোহা। এই সিদ্ধান্ত করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম। তবুও এক একবার মনে হইত, মিনি কি আমাকে আগেকার মত ভাল-বাসে না? তা বাসে বৈকি? নচেৎ আমি তাহাদের বাড়ী গেলে সে হাসিতে হাসিতে আমার কাছে ছুটিয়া আসিত না। এক্ষণে বলিয়া রাখি, এই কয় বৎসরের মধ্যে আমি একবার ডবল প্রমোশন পাইয়াছিলাম; এখন আমি এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে পড়িতেছি। কিন্তু সপ্তমশ্রেণীতে যে লোহা-চুম্বকের কথা পড়িয়াছিলাম, এখনও তাহা ভুলি নাই। কারণ সে সময় আমি ইহার উপর দুই ছত্র লভ-কবিতা লিখিয়াছিলাম :—

"লোহার তুলনা আমি, মিনি যে চুম্বক
দেখিতে সে মুখশশী হই যে উৎসুক।"

কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া এণ্ট্রাস পাশ করিলাম। বেশ আমোদে দিন কাটিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মিনিদের বাড়ী গেলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম, ২৭শে শ্রাবণ মিনির বিবাহ! আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মিনির সহিত

সাক্ষাৎ হইলে অনেক কথাবার্ত্তা হইল বটে, কিন্তু তাহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না—কেমন লজ্জা হইল। কিন্তু বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় আমার প্রাণ অহরহ ছটফট করিতে লাগিল; অশ্রুজল নায়াগ্রার ন্যায় পতিত হইয়া বক্ষঃ ভাসাইয়া দিতেও ত্রুটি করে নাই। যথাসময়ে মিনির বিবাহ হইল। বিবাহের রাত্রে মিনিকে দেখিতে গিয়াছিলাম, কারণ তখনও মিনিকে ভালবাসি। বিবাহের রাত্রে পিতৃদেবের পার্শ্বে বসিয়া আহারাদিও মন্দ করি নাই; তবে ভুলিতে পারি নাই সেই লোহা-চুম্বকের কথা। পরদিন মিনিকে দেখিতে গেলাম। মিনি কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। মিনির যখন অন্যের সহিত বিবাহ হইল, তখন আর তাহাকে দেখিতে যাওয়া কেন? মনে মনেই এ প্রশ্নের উত্তর স্থির হইল—সেই লোহা চুম্বকের কথা। কিছুদিন পরে মিনি শ্বশুর-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। মিনির এখন আর আগেকার মত ভাব নাই। সে যেন একটু গম্ভীর, সে যেন একটু সলজ্জ। ক্রমে তার দেখা পাওয়াই ভার হইয়া উঠিল। আমারও তাদের বাড়ী যাওয়ায় মন্দা পড়িয়া আসিল, শেষে একদম বন্ধ হইয়া গেল।

সসম্মানে বৃত্তি পাইয়া আমি যথাকালে এফ-এ পাশ করিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম, মিনির মনের ভাব কি? সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বরচিত কবিতাটীর কয়েকস্থল পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ করিলাম:—

"সতীলক্ষ্মী নারী মিনি, নহে ত চুম্বুক,
আমি লোহা নই শুধু প্রকাণ্ড উজ্‌বুক্‌।"

বি, এস সি পাশ করিবার পর আমার বিবাহ হইল। যাঁর সঙ্গে বিবাহ হইল, দেখিলাম তিনি মিনির চেয়েও ভয়ঙ্কর সুন্দরী। মিনি এঁয়ার

নিকট মিনি-বিড়াল! কাজেই তাঁকে খুব ভালবাসিয়া ফেলিলাম, তাঁহার শ্রেভ্ বনিয়া গেলাম, তাঁর প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম (কিন্তু বলা বাহুল্য যে, তেমার সঙ্গে তেমন "লভ" করিতে পারিলাম না, আজিও পারি নাই, এখন কিন্তু আমাদের তুইটি কন্যা)। একদিন আমার বৃদ্ধ-মাতামহ আমাদের বাড়ী আসিলেন! বৃদ্ধ বড়ই সুরসিক। তাঁর সহিত নূতন বউএর গল্প হইতেছিল। বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইতে ছিলেন। একবার হাসিতে হাসিতে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "দাদার প্রাণে যে খুব রোমান্স্ চেগেছে দেখ্‌ছি ?' বৃদ্ধের সরল প্রাণের সরল কথায় বিদ্রূপ টুকু বড় ভাল লাগিল। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "দাদামহাশয় এখনকার রোমান্সের নেশায় বিশেষ কিছু নূতনত্ব নেই। আমি আপনাকে একটী মজার গল্প বলি শুনুন। দাদা মহাশয় বলিলেন "কি গল্প ?" তখন আমি মিনিসংক্রান্ত আমার পূর্ব্বকাহিনী সমস্ত বলিলাম। বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে জোরে তামাকু টানিয়া বলিলেন, "দাদা, ওটা রোমান্স্ নয়, রোমান্সের ঠিক্‌রে।"

আমি বলিলাম "সে কি রকম ?"

তিনি বলিলেন "দাদা, আমরা তামাক খাই, ঠিক্‌রের মর্ম্ম বুঝি। ঠিক্‌রে না দিলে তামাকটা ঠিক জমে না, খেয়ে সুখ হয় না। এখন যে রাঙ্গা ব'য়ের সঙ্গে তোমার রোমান্স্‌টা বেশ ঘোরালো রকম হয়েছে, সেটা কেবল ঐ ঠিক্‌রের গুণে।"

অর্দ্ধোদয় যোগ

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, উপাধি যথেষ্ট সম্মানের সহিত লাভ করিলাম বটে, কিন্তু আজ প্রায় ৪ মাস কাল বাড়ীতে আসিয়াছি, যতই দিন যাইতেছে ততই পিতামাতার অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠিতেছি। এইরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নয়, আমাকে সংসারী করিতে তাঁহারা আমায় বিবাহ করিবার জন্য যতই অনুরোধ করিতেছেন, আমি ক্রমাগত নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছি। তজ্জন্য মাতা দুঃখিত এবং পিতা আমার উপর বিরক্ত। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে যে আমি নিজে দোষী তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না; কারণ বাল্যকাল হইতেই আমার ধারণা যে, আমি সংসারের ভার বহন করিতে একেবারে অশক্ত। বিশেষতঃ বিবাহ করিয়া একটী অজানা অচেনা বালিকাকে কেমন করিয়া আপনার করিয়া লইব, কেমন করিয়া তার মনস্তুষ্টি করিব, কেমন করিয়া তাহাকে সুখী করিব, আমি তাহার মনের মত হইব কি না, সে আমার মনের মত হইবে কি না, ইত্যাদি কতপ্রকার ভাবনা ভাবিয়া দেখিলাম, বিবাহ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে একটা দায়িত্বগ্রহণ করা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নয়; অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাজেই বিবাহ করিব না বলিয়াই একরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।

অর্দ্ধোদয় যোগ। আপামর সাধারণ সকলেই এই যোগে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিবার জন্য চলিয়াছে। আমি অর্থোডক্স্ (গোঁড়া) হিন্দু নই; তথাপি ত্রিবেণীতে গঙ্গাযমুনার পবিত্রসঙ্গমে স্নান

করিবার জন্য কৌতূহল হইল। আমার বাড়ী হইতে ত্রিবেণী বড় বেশী-দূর নয়,—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গেলে প্রায় ১২।১৩ মাইল। আমি আমার বাইস ইকেলটী লইয়া প্রত্যূষে উঠিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিব বলিয়া স্থির করিলাম। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমার একটী ভৃত্যকে উপদেশ দিয়া আমি রওনা হইলাম।

যখন মগরা পৌঁছিলাম, তখনও সূর্য্যোদয়ের অনেক বিলম্ব আছে। তখনও ম্লানচন্দ্র সাদা মেঘখণ্ডগুলির উপর দিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। মগরা হইতে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গিয়াছে। গাড়ীগুলি খুব ছোট ছোট; বহুসংখ্যক যাত্রী লইয়া ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। আজ আর কোন নিয়ম নাই। গাড়ীতে স্থানাভাব-বশতঃ গাড়ীর পশ্চাতে, ব্রেকে, পায়দানিতেও অনেক লোক চড়িয়াছে। বস্তুতঃই ইহা এক নূতন দৃশ্য! যাত্রীগণের মুখে কি এক অপূর্ব্ব উৎ-কণ্ঠার ভাব! নির্দ্দিষ্ট সময়ে গঙ্গাস্নান না করিতে পারিলে তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে। সেই জন্য এত উৎকণ্ঠা—এত ব্যস্ততা।

আমিও যাইতে লাগিলাম। দুই দিকে নিবিড় বন, মধ্য দিয়া পথ। পিপিলিকাশ্রেণীর ন্যায় ক্রমাগতঃ লোক চলাচল হইতেছে। বনপথ অতিক্রম করিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে পড়িলাম। ঠিক মোড়ে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলাম, একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা একাকিনী সেই পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, এত লোকের মধ্যেও সে একাকিনী; কেহ একবার ফিরিয়াও দেখিতেছে না। আশ্চর্য্য মনুষ্য-প্রকৃতি! নিজের লইয়াই ব্যস্ত; পরের দিকে তাকাই-বার অবসর নাই। বালিকা গৌরাঙ্গী, পরিধানে একখানি নীলাম্বরী

শাড়ী, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের সমস্ত লক্ষণ সেই কিশোরীর কমনীয় কান্তির ভিতর হইতে যেন তাহার অজ্ঞাতসারে উঁকি মারিতেছে। নিতম্বচুম্বিত কুঞ্চিত কেশদাম আলুথালু, কতক অংসোপরি, কতক কপোলে, কতক পৃষ্ঠে স্বতঃবিক্ষিপ্ত। অশ্রুপূর্ণ ভাসা-ভাসা বড় বড় চোখ দু'টী যেন কাহার অন্বেষণ করিতেছে। আমি বাইসাইকেল হইতে অবতরণ করিলাম।

দোহাই পাঠক, আমার কার্য্য দেখিয়া রোমান্সের কথা তুলিবেন না— আমি চিরকাল রোমান্স্‌কে ঘৃণা করিয়া আসিতেছি। আমার হৃদয়ে যে কখনও রোমান্স্‌ স্থান পাইবে এইরূপ ভরসাও রাখি না। কেবল-মাত্র কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এইরূপ করিতেছি। যাহা-হউক, আমি ধীরে ধীরে বালিকার নিকট গমন করিয়া তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্নে বালিকার মুখের ভাব যেন একটু পরিবর্ত্তিত হইল ;—বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিল, "মহাশয়, আমার মামা ও মামীমা আমাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিবার জন্য যাইতেছিলেন, আমি তাঁহাদের সহিত সমভাবে চলিতে না পারায় একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম, বনের পথ হইতে এখানে আসিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মামার নাম কি ?"

"বামাচরণ বাবু।"

উত্তর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। জ্ঞানহীনা বালিকা হয়ত কাহারও নাম বলিবার রীতি জানে না ;—কিন্তু আবার ভাবিলাম, এও কি সম্ভব ? বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে আলোকিত একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার হৃদয়ে কি এতটা অজ্ঞানান্ধকার থাকা সম্ভবপর ? যাহা হউক, ভাবিয়া

কিছু স্থির করিতে পারিলাম না ; পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

বালিকা বলিল, "আমার নিজের বাড়ী কোথায় তা' জানি না। আমি মাসীমার বাড়ীতেই থাকিতাম ; কাল মামা ওখানে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে কলিকাতায় যাইতেছিলাম।"

"তোমার মামা কোথায় থাকেন ?"

"কলিকাতায়।"

"কলিকাতায় ? কলিকাতার কোন্ পল্লীতে তোমার মামার বাড়ী ? তাহা না জানিলে আমি এত বড় কলিকাতা সহরে কেমন করিয়া তোমার মামার বাড়ীর সন্ধান করিব ?"

"তা জানি না ; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আমাদের বাড়ীর সামনে একটা বাগান আছে। শুনিয়াছি ঐ বাগানটীকে সকলে কোম্পানীর বাগান বলে। আর কিছুই জানি না।"

যাহা হউক, এতক্ষণে অনেকটা অনুসন্ধান পাইলাম। এক্ষণে কলিকাতায় যাইয়া অনুসন্ধান করিলে, তাহার মামার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অনেক ভাবিয়া আমি কলিকাতা যাইবার মনস্থ করিলাম। কারণ, ভাবিলাম—পল্লীগ্রামে উহার মাসীর বাড়ী যাইলে হয়ত পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে পারে। বালিকাকে বলিলাম, "দেখ, তুমি আমার সঙ্গে চল। কলিকাতায় আমাদের বাড়ী আছে, সেখানে তুমি দুই এক দিন থাকিলে, তাহার পর আমি অনুসন্ধান করিয়া তোমার মামার বাড়ীতে তোমায় রাখিয়া আসিব।" কি ভাবিয়া আমার কথায় বালিকা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। আমি পুনরপি তাহাকে বলিলাম,

"তুমি এইখানে আর একটু অপেক্ষা কর, আমি যতশীঘ্র পারি একখানি ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া আনিতেছি।"

"না—আপনি আর যাইবেন না। আমার জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নাই। যেখানে যাইতে বলিবেন আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিব।"

"বেশী দূর যাইতে হইবে না, এই মগরা ষ্টেসন পর্য্যন্ত—তুমি পারিবে ?"

"খুব পারিব।"

বালিকার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া আমি তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া সেই স্থান হইতে পদব্রজে মগরার অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। অর্দ্ধোদয়যোগে আর গঙ্গাস্নান করা হইল না।

পথিমধ্যে আমার ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে তদবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলাম এবং তাহাকে আমার হঠাৎ কলিকাতা যাওয়ার বিষয় মাতা ঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া বলিবার উপদেশ দিতেও ভুলিলাম না।

দুই দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছি; কিন্তু বালিকার নির্দ্দেশমত স্থানে তাহার মাতুলের কোন সন্ধান পাইলাম না। তাইতো, বালিকাকে লইয়া কি করি ? বড়ই ভাবনায় পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল। আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া বালিকাটী বেশ আছে! আমার বৌদিদিও তাহাকে খুব যত্ন করেন। বলা বাহুল্য, মাঝে মাঝে আমাকেও কোন একটী বিশেষ কথা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন না।

শনিবার। আমার দুইজন সহপাঠী বন্ধুর নিতান্ত আগ্রহাতিশয্য-প্রযুক্ত অদ্য থিয়েটারে ম্যাকবেথ অভিনয় দেখিতে যাইব বলিয়া আটটার পূর্ব্বে আহারাদি করিয়া তিনজনে যাত্রা করিলাম এবং থিয়েটার-হলে পৌঁছিয়া তিনখানি বক্সের টিকিট কিনিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া বসিলাম। প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইলে আমরা একবার বাহিরে আসিলাম। বাহিরে অনেকগুলি ঠিকাগাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মধ্যে একখানি গাড়ীর কোচম্যানের সহিত দুইটী বাবুর বচসা হইতেছিল।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সেইখানে যাইলাম। দেখিলাম, দুইটী বাবু খুব মদ খাইয়াছেন; একজন অপরকে বলিতেছেন "দেখ, বামাচরণ বাবু, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও; এখন ভাই যাতে দু'পেগ মেলে তার যোগাড় কর—ঠাণ্ডার চোটে সব জুড়িয়ে গেল!" বাবুটী বলিলেন,—"চল হোটেলে যাওয়া যাক্; এখনও এগারটা বাজেনি—দুচা'র পেগ পাওয়া যাবে এখন।" বাবুদ্বয় নিকটবর্ত্তী একটী হোটেলের দিকে চলিলেন। হঠাৎ "বামাচরণবাবু" নামটী শুনিয়া আমার মনে কেমন একটু সন্দেহ হইল;—আমার ইচ্ছা হইল, ঐ বামাচরণ বাবুর সহিত আলাপ করিয়া সেই বালিকার সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমার সঙ্গীদ্বয়কে সেই-খানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, আমি সেই বাবুদ্বয়ের অনুগমন করিলাম এবং হোটেলের দ্বারের সম্মুখে ফুটপাথে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদ্বয় বাহির হইয়া আসিলেন। আমি বামাচরণ বাবুকে চিনিয়াছিলাম; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় আপনার নাম কি বামাচরণ বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি চান ?"

"একটি বিশেষ কথা জানিবার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট দিতেছি, সেজন্য ক্ষমা করিবেন।"

"হেঁ হেঁ, তাতে আর কষ্ট কি—বলুন আপনার কি বলবার আছে ?"

"মহাশয় কোথায় থাকেন —জিজ্ঞাসা করতে বোধ হয় দোষ হবে না ?"

"আমি এই বিডনষ্ট্রীটেই থাকি।"

"আপনার আর কে আছেন ?"

"এ সব পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন ?"

"আজ্ঞে প্রয়োজন আছে ব'লেই বল্‌ছি।"

"আমি আর আমার ওয়াইফ, আর কেউ নেই। একথা জিজ্ঞাসা করবার আপনার উদ্দেশ্য ?"

"আজ্ঞে আমার একটু উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু আমি দেখিতেছি আমার ভুল হইয়াছে, আপনি নন—অন্য কেহ বামাচরণবাবু হবেন।"

"কেন—ব্যাপার কি বলুন দেখি ?"

"ব্যাপার এই—সেদিন অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান কর্ত্তে—" বামাচরণ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "বুঝিছি আর বল্‌তে হবে না—একটি মেয়ের কথা বলতে চাচ্ছেন ? আমিই সেই বামাচরণ। মহাশয়ের নাম কি ?"

"দীনেশচন্দ্র বসু"—

"ও—মশায় এখানে কোথায় থাকেন ?"

"—নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট—"

"মহাশয়ের সহিত আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে—কোন্ সময় আপনার বাড়ীতে গেলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে ?"

"আমি বাড়ী থেকে বড় একটা কোথাও যাই না,—আপনার কখন সুবিধা হইতে পারে ?"

"আচ্ছা, কাল সন্ধ্যার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব,—কি নাম বলিলেন ?"

"দীনেশচন্দ্র বসু"—

"দীনেশ বাবু—বেশ, তাহলেঐ কথা থাকলো" বলিয়া দুইজনে থিয়েটার-হলে প্রবেশ করিলেন। এতদিন পরে বালিকার একটা কিনারা হইল ভাবিয়া আমিও নিশ্চিন্তমনে সঙ্গীদ্বয় সমভিব্যাহারে থিয়েটার-হলে প্রবেশ করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি, এমন সময় বামাচরণ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে বসিতে বলিয়া ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিলাম। যথাসময়ে ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। বামাচরণ বাবু তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "মশায়, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; আপনি উদ্ধার না করিলে আর আমার উপায় নাই।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বিস্ময় দমন করিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, বামাচরণ বাবুর এরূপ অবান্তর কথা পাড়িবার উদ্দেশ্য কি ? যাহা হউক, আমি সোৎসুকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন মহাশয়! কি হইয়াছে, আপনি এরূপ কথা বলিতেছেন কেন ?" বামাচরণ বাবু বলিলেন, "শুনুন মহাশয়, তবে প্রথম হইতেই বলি;—"আপনার কাল রাত্রের কথাতেই বুঝিয়াছি, সেই মেয়েটী আপনার আশ্রয়েই আছে—মেয়েটী আমার ভাগিনেয়ী। অতি শৈশব অবস্থায় ও পিতৃমাতৃহীন হইয়া আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত। কিছুদিন পরে আমারও স্ত্রীবিয়োগ

হইল। আমার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের জন্য আমি দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম। আমার অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। হাতে দু'পয়সা থাকিলে কলিকাতায় সঙ্গীরও অভাব হয় না,—ক্রমশঃ আমি বখাটের দলে মিশিয়া নরকের অধস্তন সোপানে পদার্পণ করিলাম। এখন যে বাড়ীতে আছি, কলিকাতায় আসিয়া প্রথমেই ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলাম। ক্রমশঃ হাত খালি হইয়া আসিল। হাতখালি হইল বটে, কিন্তু নেশা ছুটিল না। কিসে পয়সা আসে, তার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। একে বড়লোকের ছেলে, তায় মুর্খ, চাকরী করিবার সামর্থ্য নাই। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলাম, এইবার কুসংসর্গ ত্যাগ করিব, এবং আর একটী বিবাহ করিয়া সুখী হইতে চেষ্ট করিব। বহুঅর্থের লোভে একটী বিবাহ করিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, কলিকাতায় আসিবার সময় আমার ভাগিনেয়ীকে হুগলী-জেলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রামে আমার এক আত্মীয়ার বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিলাম। এখন উহার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে অথচ আমার আত্মীয়ার কোন অভিভাবক নাই, যে উহার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিবেন; অধিকন্তু তাঁহার অবস্থাও তাদৃশ স্বচ্ছল নয় যে তিনি উহার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। কাজেই তিনি উহাকে লইয়া আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আমায় পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমিও ত্রিবেণীতে অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময় উহাকে লইয়া আসিব এইরূপ মনস্থ করিয়া গিয়াছিলাম। মগরা হইতে গাড়ী না পাওয়ায় পদব্রজেই যাইতে-ছিলাম, তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনি জানেন।"

"তারপর আপনি আপনার ভাগিনেয়ীরে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি?" আমার এই প্রশ্নে লোকটা আমতা আমতা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বুঝিলাম, লোকটা কি পাষণ্ড! লোকটার উপর আমার বড় রাগ হইল; কিন্তু মনের রাগ মনে চাপিয়া রাখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটীর পিত্রালয় কোথায়?

"তারকেশ্বরে"—

"ওর পিতার নাম কি?"

"হরিচরণ ঘোষ"।

এই হরিচরণ ঘোষের নাম শুনিয়া আমার মনে যেন একটু খট্‌কা লাগিল। যেন ঐ নাম কোথায় শুনিয়াছি বা ঐ নামীয় লোকটীকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল! যাহা হউক, মনের ভাব গোপন করিয়া বামাচরণবাবুকে বলিলাম, "আপনি এক্ষণে কি বলিতে চান?"

"সে ত আপনাকে বলিয়াছি,—আমি বিপন্ন, আমায় উদ্ধার করিতে হইবে;"—বামাচরণ বাবু আর বলিতে পারিলেন না। আমিও এতক্ষণে তাঁর কথার ভাব বুঝিতে পারিলাম। বোধ হয় তাঁর কথা শুনিয়া আমার মুখখানা তখন লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ আমার বেশ মনে আছে, আমি সে সময় মস্তক নত করিয়াছিলাম। সেই সরলা বালিকার উপর বামাচরণ বাবুর ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া আমার বড় রাগ হইতেছিল, এবং তখন সেই বালিকার অশ্রুপূর্ণ বড় বড় চক্ষু দুইটী পুনঃ পুনঃ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছিল। আমার মৌনভাব দেখিয়া বামাচরণ বাবু কি ভাবিলেন;

পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি বিবাহ হইয়াছে?" আমার মুখ কি জানি কেন এবারেও লাল হইয়া উঠিল; আমি নতমুখে উত্তর করিলাম—"না"। বামাচরণ বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা এখানে আছেন?"

আমি বলিলাম "না, তিনি দেশে থাকেন; এখানে আমার দাদা আছেন।"

এমন সময় দাদা সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিবামাত্রই বলিলাম, "দাদা, ও মেয়েটী এঁরই ভাগিনেয়ী, আমি বাড়ীতে বলিগে" এই কথা বলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সেই বালিকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। প্রথমেই সুসংবাদটা তাহাকে দেওয়া উচিত ভাবিয়া বলিলাম "তোমার মামা আসিয়াছেন"; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বালিকা এ কথায় কিছুমাত্র বিস্ময়ের বা আহ্লাদের ভাব প্রকাশ না করিয়াই বলিল "জানি;"—আমি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই দেখি সে চলিয়া গিয়াছে। আমি বরাবর বৌদিদির নিকট গমন করিলাম। বৌ-দিদি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "দেখ ঠাকুরপো" আমার কথা ঠিক কি না; যা' বলেছিলাম কাজে তাই দাঁড়াচ্চে। যা হোক, ঠাকুরপোর গঙ্গাস্নান না ক'রেই ফল হ'ল মন্দ নয়।"

আমি ত অবাক্! বৌদিদি আবার বলিলেন, "অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌চো কি, আর ত তোমার জিদ রইলো না; গুটীপোকার মত আপনার জালে আপনিই জড়িয়ে পড়লে,—লালা এখন ঘাড়ে চাপ্‌লো ত?"

আমি আরও বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "লীলা কে বৌ-দিদি" ?

"আমার মাসতুতো বোন ওরফে হবু-জা"

"আমি বুঝতে পারলুম না,—বৌ-দিদি—"

"যাকে তুমি এনেছ গো, সেই লীলা, এখন আবার ন্যাকাপনা কচ্ছো কেন ?" আমরা তোমাদের কথা সব শুনেছি। তুমি আর লীলার মামা বৈঠকখানায় বসে যা বল্‌ছিলে, মোক্ষদা বুড়ী সব শুনে এসে আমায় ব'লেছে।" লীলা ত তারকেশ্বরের হরিচরণ ঘোষের মেয়ে, হরিচরণ বাবু আমার ছোট মেশোমশায়,—সেবার কলেরা রোগে মেশোমশায় ও মাসীমা দুজনেই মারা যান"। বৌদিদির চোখের কোণে দুইটী মুক্তা দেখা দিল। আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনতিবিলম্বে দাদা বামাচরণ বাবুকে বিদায় করিয়া অন্দরে আসিলেন, এবং তাঁহাকে দেখিয়া আমি দোতালার আমার নির্দ্দিষ্ট পড়িবার ঘরে চলিয়া আসিলাম।

পড়িবার ঘরে আসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। সেই অর্দ্ধোদয়যোগে ত্রিবেণীযাত্রা হইতে সমস্ত ঘটনা একে একে মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া টেবিলের উপর পড়িয়াছিল। টেবিলের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুস্তকাদির মধ্যে একখানি ফটো ছিল,—নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে আমি ফটোখানি তুলিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম। সহসা সেই ফটোখানার উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দেখা সম্ভব, আমি নিবিষ্টমনে দেখিতে লাগিলাম। ফটোখানি লীলার, আমাদের উঠানের ফুলবাগানে দাঁড়াইয়া লীলা একটী গোলাপের কুঁড়ি

তুলিতেছে। যত দেখি—ফটোখানি ততই সুন্দর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, কালকাতায় আসিয়া বামাচরণ বাবুর সন্ধান না পাওয়ায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিবার উদ্দেশে লীলার ফটো তোলাইয়াছিলাম। ফটোখানি নিবিষ্টমনে দেখিতেছি, এমন সময় বৌদিদি আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়াই বলিলেন, "ঠাকুরপো, বলি হচ্ছে কি? আলোটা জ্বালবারও ফুরসৎ হয়নি? লজ্জায় আমার মুখ দিয়া আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; আমি ফটোখানি লুকাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ তাহা আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। বৌদিদি তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন এবং সহাস্যে বলিলেন, "ওঃ! আমি মনে করি কি কচ্ছে ঠাকুরপো!—ওমা! আড়ালে এসে ছবি নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছে! আর ভাবনা কি ঠাকুরপো, শুভকাজ শীঘ্রই হয়ে যাচ্চে। কাল ভোরের ট্রেণে তোমার দাদা বাড়ী গিয়ে সকলকে নিয়ে আসবেন; শীঘ্রই একটা শুভদিন দেখে শুভকার্য্য সম্পন্ন করা হবে। অন্য যায়গায় হলে কিছু পাওয়া যেতো, এখানে শুধু পান-সুপারী। এখন চল, খাবার দিয়েছি—"

বৌদিদির কথা শুনিয়া আরও লজ্জিত হইলাম, কোন কথা বলিতে পারিলাম না। মনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে খাইতে বসিলাম। আমি একা খাইতে বসিয়াছিলাম,—অন্যমনস্ক-ভাবে যা পারিলাম খাইয়া উঠিয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য, সেদিন আমার সম্মুখে দুধের বাটী ছিল—দেখিতে পাই নাই, দুগ্ধ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। বৌদিদি সেজন্য টিটকারী দিতে ভুলেন নাই;—তদুত্তরে আমি মিথ্যা গুরুভোজনের ওজর করিয়াছিলাম মাত্র!

মাঘমাসের ২২শে লীলার সহিত আমার বিবাহ হইল। এতদিন

যে রোমান্স্‌কে ঘৃণা করিয়া আসিতে ছিলাম, আজ দেখিলাম সেই রোমান্স্‌ আমার ঘাড়ে চাপিল। সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও বুঝিতে পারিলাম, অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য যাত্রা করিলেও ফল হয়!!
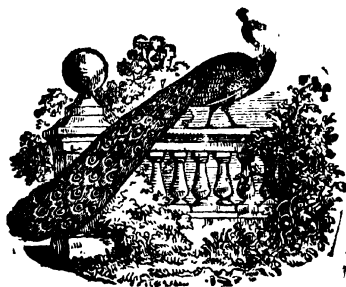
নিরুদ্দিষ্ট।

তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। মাঠের গরুগুলা রাস্তার ধুলা আকাশ পর্য্যন্ত উড়াইয়া সবে মাত্র গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। তখনও দুই চারিজন কৃষক ধানের প্রকাণ্ড বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। মাঠের পাখীগুলা কেমন একটা মিশ্রিত কলরব করিতে করিতে দুই একটা করিয়া মাঠের ধানের গাদা হইতে উড়িয়া যাইতেছিল। ধানের আটিগুলি নগ্নমাঠের স্থানে স্থানে থাকিয়া তখনও তাহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছিল। ছয় বৎসর প্রবাসবাসের পরে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। সেই সময়ে আমার মনের ভাব কিরূপ হইতেছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যেন কতকাল দেশ ছাড়িয়া, বাল্যবন্ধুগণকে ছাড়িয়া, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া কেমন একটা নির্জ্জনতার মধ্যে সঙ্গশূন্য অবস্থায় এই সুদীর্ঘ ছয়টী বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছি; আজ আবার সেই চিরপরিচিত জন্মভূমিকে দেখিয়া, সোদরসম বাল্যবন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে, কি অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিব, সেই চিন্তায়, সেই আশায়, সেই উৎসাহে যেন আমার পথশ্রান্ত পদযুগল আমাকে দ্রুততরবেগে লইয়া যাইতে লাগিল। চিরপরিচিত পুরাতন জিনিসগুলি যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাস্তার পাশের সেই উঁচু ঢিবিটা, যেখানে বসিয়া কতদিন নগেন 'ফুলট' বাজাইয়াছে, অতুল কত গান গাহিয়াছে,

সেটা সেইখানে সেই ভাবেই আছে, কিন্তু আগাছায় ঢাকা। নগেন বোধ হয় আর ওখানে বসিয়া 'ফ্লুট' বাজায় না, মুতুলও গান গায় না। সেই গাঙ্গুলীদের তালপুকুর—ওখানে কত সাঁতার কাটিতাম, কত মাছ ধরিতাম, সে ত সবে ছয় বৎসরের কথা, তখন পুকুরটী বেশ পরিষ্কার ছিল, কাকের চক্ষুর মত স্বচ্ছজলের তলা পর্য্যন্ত দেখা যাইত। এই ছয় বৎসরে তার এত পরিবর্ত্তন! স্নানের ঘাটের খানিকটা অংশের কেবল মাত্র জলটুকু দেখা যাইতেছে; বাকী সমস্ত পুকুরটী দলদামে ঢাকা। এই কি সেই চৌধুরীদের বাগান? কেবলমাত্র কয়েকটা মগ্ন আম, কাঁঠাল, ও নারিকেল গাছ,—পাতায় পাতায় মাকড়সার জাল, এবং মূলদেশে কতকগুলি কণ্টকিত আগাছা লইয়া মাথা উঁচু করিয়া অতীতের স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে! বাড়ীখানির আর পূর্ব্বাবস্থা নাই—ছাদের কার্ণিসের ধারে নানা প্রকার আগাছা, দুই একটী অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে। যে বাড়ীখানি একদিন জন-কোলাহলে ও গীতবাদ্যের মধুর নিনাদে দিগন্ত মুখরিত করিয়া মধুর আনন্দ-হিল্লোলে ভাসমান থাকিত, আজ তাহার ঈদৃশ শোচনীয় দশা! সেই সুদৃশ্য নয়নরঞ্জন বিশাল গৃহখানি আজ যেন শ্মশানের প্রেতলীলাস্থলস্বরূপ হইয়া চর্ম্মচটিকা ও বাদুড়ের আবাসস্থল হইয়াছে! গ্রামের সবই পূর্ব্বের মত হইলেও কেমন যেন একটা প্রবল নিরানন্দের অদৃশ্য-আবরণে আবৃত! যেন একটা কিসের অভাবে সমস্তই শ্রীহীন!

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বৌদিদির সহিত সাক্ষৎ হইল। বৌদিদি আমায় দেখিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে ঠাকুরপো! কেমন করে হঠাৎ এলে?"

"কেন, আপনারাই ত আস্‌তে লিখেছিলেন।"

"ওকথা ব'লোনা ঠাকুরপো ; অমন তোমায় কতবার আস্‌তে বলা হয়েছে। প্রথমে ত তোমার সন্ধানই পাওয়া যায় নি; কত খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিছুই হয় নাই ; তার পর মামাশ্বশুর তোমার সন্ধাম ব'লে দিলেন। কত সাধ্যি-সাধনা ক'রে য্যাদ্দিনের পর তোমার খবর হ'লো। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কি রকম লোক ? এই ছ'বছর দেশ-ছাড়া ছিলে, তাকি একটী দিনের তরেও আমাদের জন্য তোমার মন কেমন কর্ত্তো না ? তা আমাদের জন্যে না করুক, আমরা না হয় পর, বুড়ো-মা ত পর ন'ন ?"

বৌদিদির কথায় আমার চক্ষে জল আসিল। যে তুচ্ছ অভিমান লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ আমার সে অভিমান যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। ভাবিলাম, সত্যই আমি কি নিষ্ঠুর! আমি চক্ষু মুছিলাম দেখিয়া বৌদিদি বলিলেন,—"কাঁদচো কেন ? ছিঃ—" এমন সময়ে মা আসিলেন ; বৌদিদি মাকে বলিলেন, "মা, দেখ, ঠাকুরপো এসেছে, দু'কথা বলেছি বলে কাঁদচে, ঠাকুরপো'র এখনও ছেলেমানুষী যায়নি দেখচি।"

মা বলিলেন, "তা কাঁদুক, আমাদের এই ছ'বছর কাঁদিয়েছে ; এদেশ ওদেশ ক'রে ঘুরে বেড়ালে, একটী দিনের জন্য একটা কাকের মুখেও একটা সংবাদ দেয় নি। আমাদের উপর যার এতটুকু মায়া নেই, তার চোখে জল শুধু লোক-দেখানো। সন্তানের জন্য মায়ের দেহের সমস্ত রক্তটুকু জল হয়ে যেমন চোখ দিয়ে বেরোয়, এ তেমনটী নয়,—এতে কৃত্রিমতা আছে। বৌমা, ওর কথা আর ব'লো না, ও এখন মানুষ

হয়েছে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে, এখন মায়ের দুঃখের কথা ওর ভোলবার সময়। এই জন্যই ত পেটের ছেলের ভরসা না কোরে যোগেশের ছেলেটাকে সারাদিন বুকে কোরে নিয়ে থাকি। কেন, জানো? সে এখন শিশু, এখনও মানুষ হয়নি; সে এখন লোককে কাঁদায় না, বরং অপরকে কাঁদতে দেখলে নিজে কেঁদে ফেলে। কেন কাঁদে, তা সে জানে না। তুমিও বৌমা, ছেলের ভরসা ক'রো না। ছেলে যতদিন ছেলে থাকে, ততদিন সে সরল ও মমতাপূর্ণ,—আর মানুষ হ'লেই সে পর।"

এমন সময় "কত্তামা"—"কত্তামা" বলিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল (যাকে নিতান্ত শিশু দেখিয়া আসিয়াছিলাম) মা'র কাছে ছুটিয়া আসিল। মা তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। গোপাল বলিল—"কাকার কাছে যাবো।" তদুত্তরে মা দুইহস্তে গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"না দাদা, কাকার কাছে যেতে নেই—তুমি আমার কাছে থাক, চল তোমায় ভাল খেলনা দেবো।" এই কথা বলিয়া মা বৌদিদিরও হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন যাইবার সময়ে কেবল উদাসনয়নে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন মাত্র।

মা'র কথা শুনিয়া বিস্ময় চিন্তায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়া তখনকার কর্ত্তব্যটুকুও ভুলিয়া গেলাম। সজিনাতলায় একটা ভাঙ্গা মোড়া পড়িয়াছিল; তাহাই টানিয়া লইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সে স্নেহময়ী জননীর সমস্ত স্নেহটুকু ভোগ-দখল করিবার জন্য দুই ভা'য়ে কত ঝগড়া, কত মারামারি করিয়াছি; শুধু তাহাই নয়, বাস্তবিক যাহা

কার্য্যে পরিণত করিয়াছি, যিনি একটা দিনের জন্য আমাকে না দেখিলে সমস্ত পৃথিবী শূন্য দেখিতেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতেন, কেবল মাত্র যাঁহার আদরেই আমার স্বভাব নূতনভাবে গঠিত হইয়াছে, আজ সেই স্নেহের আধার জননীর একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তাঁর সেই স্বভাব-সুলভ কোমলতা, স্নেহ-প্রবণতা আজ কোথায়? মা কি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? এরূপ চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দিতে যেন বুক্ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যাঁর করুণার আবরণে থাকিয়া শৈশবের সেই সুখের দিনগুলি কেমন মধুর আনন্দের সহিত কাটিয়া গিয়াছে, আজ সেই করুণাময়ী মা'র একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের পর গৃহে আসিলাম, মা একটীও কথা কহিলেন না। বৌদিদির শুষ্কহাসিতে কি যেন একটা করুণ বেদনার ছায়া প্রতিভাত! প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে মনে যে একটা অভিনব আশা ও আনন্দের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এখন একটা অজানিত বেদনার উত্তাপে তাহা শুকাইয়া গেল! যতই এরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, ততই প্রাণের আকুল বেদনায় আত্মহারা হইয়া পড়িতে লাগিলাম!

একটা বিস্ময় বেদনা তন্ময়তার মধ্যেও বৌদিদির কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—"কনক, ঠাকুরপোকে ডাক, মা কেমন কচ্ছেন;"—একি, এ আবার কি হইল? আমি ত্বরিৎপদে মাতার কক্ষের দিকে ছুটিলাম। কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মা দুই হস্তে গোপালকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন, আর বৌদিদি মা'র নিকট হইতে গোপালকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, ছেলেটাকে ডাকিনীর

হাত থেকে ছাড়িয়ে দাও, ন[illegible] ম'রে যাবে।" বৌদিদির কথায় বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মা বলিলেন, [illegible] বৈকি—মা না হ'লে আর ডাকিনী কে? মা সন্তানকে নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, তাই মা ডাকিনী। মা বুকের রক্ত দিয়ে ছেলেকে মানুষ করে, তাই মা ডাকিনী। সন্তানের দুঃখে সকলের চেয়ে আগে মা'র প্রাণ কেঁদে ওঠে, তাই মা ডাকিনী। মা সন্তানের আশাপথ চেয়ে অনাহারে অনিদ্রায় চোখের জল সার কোরে ব'সে থাকে, তাই মা ডাকিনী। তুই ত এর মা, তুইই ডাকিনী, তুই স'রে যা।"

মা গোপালকে আরও জড়াইয়া ধরিলেন। গোপাল কাঁদিয়া উঠিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম দেখিয়া বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, কি দেখছো, মা কি আর সে মা আছেন? উনি এখন পাগল। ছেলেটাকে বুঝি মেরে ফেল্লেন,—ওমা কি হবে!" বৌদিদি কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন আর ব্যাপারটা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। স্নেহময়ীর হৃদয়ের অপার পুত্রস্নেহই তাঁহাকে পাগল করিয়াছে? যাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না, সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তাহার অদর্শনে অভাগিনী আজ উন্মাদিনী! তাঁর দুঃখ তাঁর সহনশক্তির সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই আজ তিনি উন্মাদিনী। জ্ঞান হারাইলেও হৃদয়ের অপার স্নেহটুকু হারান নি; তাই তার উদ্দামগতি ভিন্নমুখী করিবার জন্য বালক গোপালের প্রতি এত অনুরক্ত। নিজের সন্তানের মত পাছে গোপাল পর হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় গোপালকে চোখে চোখে বুকে বুকে ক'রে রেখেছেন। বৌদিদি এই টুকু বুঝিতে না পারিয়া, পাছে সন্তানের অকল্যাণ হয়, তাই তাকে মা'র কাছ হইতে

ছিনাইয়া লইতে এত ব্যস্ত। হায় [illegible]বোধ নারী। তুমিও ত পুত্রের জননী! তুমি এখনও পু[illegible]র মর্ম্ম বুঝতে পারলে না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা আমার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল, আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলাম।

আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। একি স্বপ্ন! কোথায় প্রকৃতি দেবীর অঙ্কের একটী নিভৃত শান্তিময়ী পল্লী, আর কোথায় সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের পবিত্র তীর্থধাম বারাণসীক্ষেত্র! আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। তখন ঘোলাটে কুয়াশার ভিতর দিয়া অল্প অল্প সূর্য্যকিরণ আমার কক্ষের মুক্ত বাতায়নপথে প্রবিষ্ট হইতেছিল। পাশের ঘর হইতে অবিনাশবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"কি হে হরেন, এখনও উঠ নাই বুঝি! সকালবেলা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে না কি?"

তাঁহার প্রশ্নে আমি একটু লজ্জিত হইলাম। কিন্তু স্বপ্নের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না এবং তাঁহাকেও বিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলাম না।

নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পিতামাতার অজস্র তিরস্কার, অজস্র ধিক্কার আমার মনে যখন কেমন একটা বিদ্রোহভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল, তখন একদিন সন্ধ্যার ধূসর কোল আশ্রায় করিয়া গৃহত্যাগ করতঃ সুদূর বারাণসীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে আজ ছয় বৎসরের কথা। এই সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল বাড়ীতে কোন সংবাদাদি প্রেরণ করি নাই। পিতামাতার উপর অযথা অভিমানই ইহার কারণ। মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে 'নিরুদ্দেশ' শীর্ষক বিজ্ঞাপন পাঠে আমার জন্য আমার

পিতামাতার উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে[illegible]ত আকুল ক্রন্দনের কেমন একটা অস্পষ্ট ছায়া আমার সমস্ত অভিমানকে ভা[illegible]রিয়া কোন্ দিকে সরাইয়া দিয়া, কোথা হইতে শনৈঃ শনৈঃ মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিতেছিল। শুভক্ষণে অবিনাশবাবুর সুনজরে পড়িয়াছিলাম বলিয়া, এই ছয় বৎসর কাল তাঁহার বাটীতেই আছি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া রেলের আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে একটী চাকরী করিয়া দিয়াছেন। অবিনাশবাবুর পত্নী করুণাময়ী আমাকে সন্তানের অধিক স্নেহ করেন। তাঁহার পুত্র মনীন্দ্রকে আমি পড়াই। দিনগুলি বেশ এক রকম কাটিয়া যাইতে ছিল। হঠাৎ গতরাত্রের ভীষণ দুঃস্বপ্নে আমার মন বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল।

এক্ষণে বলিয়া রাখি, অবিনাশবাবুকে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় দিলেও কয়েকটী বিষয় গোপন করিয়াছিলাম।

আজ কয়েক দিন হইতে আমার মনের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে-ছিল। সর্ব্বদাই যেন কেমন অন্যমনস্ক থাকিতাম,—থাকিয়া থাকিয়া কোথা হইতে এক অজানা দুঃখের ঝড় বহিয়া আমার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিত।

সে দিন আফিসে গেলাম বটে, কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিলাম না। পাঁচটার সময় ফিরিলাম। বাড়ী পৌঁছিতেই অবিনাশবাবুর পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরেন, তোমার কি হয়েছে ? সমস্ত দিন কাঁদলে যেমন চোখ করমচার মত লাল হয়, তোমারও ঠিক তেমনি হয়েছে ; কেন বল দেখি ?" ধূলা লাগিয়া আমার চক্ষু উঠিবার উপক্রম হইয়াছে, এইরূপ দু' একটী মিথ্যা বলিয়া আমি তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে আসিয়া মনীন্দ্রকে

নিরুদ্দিষ্ট।

পড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু প[illegible] নামমাত্র। নিজের শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া [illegible] পড়িলাম। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা আসিল না। স্বপ্নের দারু[illegible] উৎকণ্ঠা লইয়া প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিলাম। এইরূপে দুই তিন দিন কাটিল। অবশেষে একদিন অবিনাশবাবুকে আবশ্যকমত সব বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা ছেলেমানুষ কিনা, তাই ওরূপ স্বপ্ন দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়। স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়?" যাহা হউক, আমি তাহাতে শান্ত না হইতে পারিয়া, দুই মাসের ছুটির জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা তিনি বড়-সাহেবকে বলিয়া আমার দুই মাসের ছুটী মঞ্জুর করিয়া দিলেন। আমি ছুটী পাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন ঠিক অপরাহ্নে গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তে সেই নিদারুণ-স্বপ্ন আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

গ্রামে পৌঁছিলাম। পা আর চলে না—যেন একটা দারুণ উদ্বেগ, যেন একটা ভাবী বিষাদের কল্পনা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া আমায় আকুল করিতেছিল,—কিসের একটা প্রবল আশঙ্কা আমার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর করিতেছিল,—চলৎ-শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ঐ যে আমাদের বাড়ী, ঐ প্রবেশদ্বার দেখা যাইতেছে, ঐখানে প্রবেশ করিলেই সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইবে! আমার অপরিণামদর্শিতার বিষময় ফল, আমার নিষ্ঠুরতার নিদারুণ শাস্তি, আমার তুচ্ছ অভিমানের

মর্ম্মভেদী পরিণাম এখনি আমায় [illegible] হইবে। এইরূপ নিদারুণ দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু শতগুণে

অনেক কষ্টে দ্বারে পৌঁছিলাম,—ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না,—পা কাঁপিতে লাগিল—দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠিল,—প্রাচীর গাত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না,—মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল,—তারপর কি হইল জানি না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম আমাদের সেই চিরপরিচিত গৃহের একটী চিরপরিচিত কক্ষে একটী চিরপরিচিত স্নেহময় অঙ্কে আমি শায়িত। পরিপূর্ণ আবেগে ডাকিলাম,—"মা! তোমায় যে আর দেখতে পাব, এ আশা ছিল না"—আর বলিতে পারিলাম না। মা বলিলেন—"বাবা, আমিও যে আর তোকে দেখতে পাবো সে আশা করিনি; এখন কোলে পেয়েও তোকে দেখতে পাচ্ছিনি, এমনি দুরদৃষ্ট!"